তিন পর্ব

রামশঙ্কর চৌধুরী

নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর ১৯৬৪

প্রকাশক :
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক :
শ্রীহিমাদ্রী রায়
রামকৃষ্ণ প্রেস
৯এ রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

মাকে আর আমার বোন সুষমাকে
যাঁরা আর নেই।

রামশঙ্কর চৌধুরী

উপন্যাসটি পর্য্যবেক্ষক শারদীয় সংখ্যা ১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু যা প্রকাশিত হয়েছে, তার সঙ্গে উপন্যাসের মিল কম।

আমার জীবনে, কাছের থেকে দেখা জীবনকে দেখার প্রতিফলন এই উপন্যাস।

—লেখক

তিন পর্ব

প্রথম

(ক)

বর্ষাটা পেরিয়ে গেলেই কষ্ট হয় ভূষনের।

বর্ষান্তেত কষ্ট হয়। ভাবনা হয়। তবে ভাবনাটার রকম অন্য। বর্ষায় শরীরটা ভেজে। রাতে বর্ষা নামলে মাথাটা বাঁচিয়ে রাখায় জন্য ঘরের কোনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অবশ্য। সারাটা রাত তার চোখে চোখ দেবার উপায় নেই। তবে গতর থাকলে এ যন্ত্রনার হাত থেকে পরিত্রান পাবার একটা সহজ উপায় আছে—খড় দিয়ে ছাদন করতে না পারলে, তাল পাতা আছে। অন্তত জলের তোড়টা সামলানো যায়।

কিন্তু ভাদর মাসের এই কর্পকে কোনো মতেই সামাল দিতে পারেনা। চার বছরের ছেলেটা কাঁদতে থাকে মিইয়ে মিইয়ে, চৌদ্দ বছরের মেয়েটা বাপের পানে প্রত্যাশা ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে, সাত-আট বছরের মেয়েটারও ওই অবস্থা। বুড়ী মা, যে কিনা সারা সকালটাই কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে সারাটা দিন আস্তাকুড় ঘেঁটে ঘেঁটে নিয়ে আসত পোড়া কয়লা, সার শুকনো কাঠের টুকরো, সেই মানুষটা তালি মারা শাড়ীটা কোলের উপর নিয়ে আবার তালি মারে। আর ভামি তার রোরুদ্যমান ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নাচায় তাতেও যদি ছেলেটা তার কান্না বন্ধ না করে তখন বিরক্ত হয়ে, ছেলেটাকে মাটিতে আছড়ে বলে, মর মরে যা। ছেলেটা কিন্তু মরার ভয়েও তার কান্না থামায়না।

এসব ঘটনা প্রত্যহ ভূষনের চোখের সামনেই ঘটে আর তখুনি মেজাজটাও গরম হয়ে যায়। ভিতরে ভিতরে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করে। ইচ্ছা করলেই একটা কুরুক্ষেত্র ঘটাতে পারে ভূষণ, কিন্তু তাতে অশান্তি বাড়িবে বৈ কমবেনা। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বড়ো মেয়েটাকে বলে, ছিলা-টকে ঘুরাট নিয়ে আয় মাত্রি।

ভামি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয়, ছিলার কাঁদন ভুলাতে যাবেক ত পেটের কাঁদন কে ভুলাবেক? যা তুই, বসে বসে উকুন পিল্‌কালে তো প্যাট্ ভরবেক্ নাই।

মানি এতকাল মা-না-বলতেই সব কাজ করে এসেছে বলতে হয়নি কাকেউ-খাঁচি নিয়ে পুকুরে গেছে গুগ্‌লি, শাক তুলে এনেছে, কেউ কোনো বাধা দেয়নি, কিন্তু

ইদানীং পুকুরে নামা বারণ বাবুরা ডিম ফেলেছে বর্ষায় সে ডিম এক দের আঙুল করে বেড়ে পনা হয়েছে। ওরা আবার পুকুর কিনারাতেই দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। ধব্-ধবে শাদা জীবগুলিকে একই সাথে ইছা মত ঘুরতে ফিরতে দেখার আনন্দ আছে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু হাত দিয়ে ধরতে গেলেই পালিয়ে যায়। এ সময় পুকুরে নামা বারণ ভামিও জানে এই নির্দেশ, তবু মামি মাকে বাবুদের হুকুমটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, পোখোরে নামতে দেয়না যে।

ক্যানে ? জিগ্যেস্ করে ভুষণ।

বলে লোতুন পনা।

ভামির মেজাজে যেন আগুন ধরে। সে হাত নেড়ে নেড়ে বলে শাগ্ তুলবি, গোগলি তুলবি পনা ত আর ধরবি নাই।

মানি মুখ খানা বিরক্তিতে কালো হয়ে উঠে। মনে মনে গুমরে ও জলে নামতে দেখলেই তেড়ে আসে পরমেশ্বর বলে লগদীটা। তাতেও যদি জল থেকে না উঠে, তবে হাতের লম্বা লাঠিটা দিয়ে শরীরের বিশেষ স্থানে খোঁচা দিয়ে বলে, উঠে যা।

এ ঘটনা ঘটেছে মানির ক্ষেত্রেও।

মানি তবু গিয়েছে। ঠিক সেই সময় যখন ঘাটে লোকজন থাকত। কিন্তু আর যেতে চায়না সে।

না, আমি যাব নাই। বলে মানি।

লগদী বলেছে জলে নামলেই ধরে নিয়ে যাবে সে, তার পর যদি পনাও আচল ছেঁকে ধরে তবু সে আপত্তি করবেনা। কিন্তু ভয় করে মানির। যাবি নাই তো খাবি কি ? মরবি যে না খেঁয়্যা। এই বয়সেই তো ওই চেহারা—তিক্ত কণ্ঠে বলে ভামি।

মেয়েটার কান্না পায় মায়ের কথায়, আর নিজের আসহায় অবস্থা বিবেচনা করে, কান্না-ভরা চোখ নিয়ে বাপের দিকে তাকায় ভুবনের পানে। ভুবনের মায়া হয় মেয়েটাকে। সংযত স্বরে বলে, গোগলি আর শাক্-পাতা তো খাল তোবেত পাবি বিটি, যা।

বাপের নরম কথায় কাজ হয়, মানি চোখ দুটো মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়।

তবু কিন্তু ভামি চুপ করেনা। নিজের কপাল, ছেলে-মেয়েগুলোর পাথর চাপা কপাল, তারপর তার শক্ত সমর্থ ঘরদের পোড়া কপালকে পুরো পুড়িয়ে দগ্ধ করে ভিতরের কাঁথা কাঁথুড়ি টেনে টেনে এনে বাইরের চালে ফেলে ত্যায়।

এ-সবই ত্যাখে ভূষণ। নাটক দেখার মত করে, ত্যাখে। কখনো হাসি পায়, কখনো রাগ, আবার কখনো চোখ দুটো কর কর করে উঠে। এই সঙ্গে ভাবনা-সামনের মাসগুলোর কথা। বড়ো অসহনীয়। চাষ উঠলো কি উপোস-একে-বারে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকা যতই ভাবে ততই যেন বেদনার সমুদ্রের অতলে চলে যায় ভূষণ সাঁতারে যে মাটির উপর পা রেখে দাঁড়াবে-এখান থেকে তার ভুল কিনারা দেখতে পায়না ভূষণ। নিজেই বিচারক হয়ে নিজেই দাঁড় করিয়েছে মানির মাকে আসামীর কাঠ গোড়ায় আগেয় বছরও। ভামি খাবার কথা বলতে এলেই বলেছে, টুটি টিপে মার ছিলা-গলানকে তবে খাড্যা পাবে। এত পেট্ কে ভরাতে পারে।

ভামিতো সাথে সাথে জবার দিয়েছে, বাপ হৈড্যে কে বলেছিল। বলি, গোকুল বাউরীর তো-এক-ট প্যাট্ তবে উ না-খায়্যা ম'ল ক্যানে? ঠিক্, প্রতিবাদ করতে পারেনি ভূষণ। বাউরী ঘরে—পরিবারে, এক জন থাকলেও না খেয়ে উপোষে মরে আবার বড়ো পবিরার হলেও উপোষে মরে। এই ভাদর মাসটাই হলো—মরনের মাস। ওৎপেতে বসেই থাকে ব্যাটা যমরাজ, ভাদ্র এলেই হা হা করতে করতে আসবে বাউরী পাড়ার ঘরে ঘরে।

এমনি সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সকালটা কেটে যায়। যতই বেলা বাড়ে, এতই পেটের জ্বালা বাড়ে কান্না বাড়ে—তারপর জ্বালার যন্ত্রনাতেই এক সময় কান্না থেমে যায়। তখন আরো যেন বীভৎস রুক্ষ কুৎসিৎ মনে হয় সংসারটা এরই মধ্যে মানি যদি কিছু নিয়ে আসে—শাক্ হোক্ পাতা হোক্ গোগলি শামুক যাই হোক্ তাই কাড়া-কাড়ি করে খায়।

সেদিন মানি হাঁটু অবধি কাদা লাগিয়েএক আচল শাক্ আর গোগলি এনে উঠানের উপর নামিয়ে দিতেই ভামি বললো, গোগলিগুলা বাচ্ছা রাখ নাপিত বৌ লিবেক।

মানি এতক্ষণ ধরে চার পাচটা ডোবার জলে ঘুরে ঘুরে শাক্ তুলেছে। জলের তলে পাঁকের মধ্যেখান থেকে হাতা চালিয়ে খুজে খুজে ধরেছে গোগলি, কখনো আবার শালুক পাতার তলে বেটা নিশ্চিন্তে, বসে থাকা গোগলিগুলি পট্-পট করে টেনে নিয়ে আচলে পুরেছে। তাই এ সমপদের বণ্টন ব্যবস্থার ব্যাপারে তার একটা অধিকার ত আছে, তাই বললো, বাবা খাবেক নাই?

জুটে তো যাবেক, বললো ভামি, তার তুব ভাবনা কিসের?

নিজের জন্ম ভাবেনা মানি, মরমা ডোবায় এক বুক জলে নেমে কয়েকটা

শালুক গেঁড়ী খেয়ে নিয়েছে সে। নিয়েও এসেছে একটা-পুড়িয়ে খেতে বেশ মিষ্টি লাগে।

আঁচলটা ঢালতে গিয়ে লুকিয়ে আনা গেড়ীটা মাটিতে পড়তেই আট বছরের বোন গেনি সেটা খপ্ ক'রে তুলে নিতেই মানি গেনির হাত থেকে সেটা নিলো আর তখুনি গেনি দিদির উদোম্ পিঠে গুম্ গুম্ করে কয়েকটা কিল মেরে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, ত্থাখ্ মা গেড়ী দিছে নাই।

ভামি তখন সবে শাক্গুলো কুড়িয়ে রাখছিল। সে শাক্গুলো ঝেড়ে ঝেড়ে তুলতে তুলতে বললো; পেটে পুড়ুক, পেটে আগুন। একটা শালুক গেড়ী নিয়েও কামড়া কামড়ি! উয়াকে দিয়ে দে মানি।

মানি বললো, না, দিব নাই। দিব ক্যানে? উ নিয়ে আসুক। ভামির মেজাজটা গরম হয়ে গেলো মেয়ের উত্তর শুনে। আপাতত হাতের কাজটা মুলতুবি রেখে অবাধ্য মেয়েকে শিক্ষা দেবার জন্যই উঠে এসে মানির পিঠের উপর দুমাদুম কয়েকটা ঘা দিয়ে গেঁড়ীটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে দিল। নরম গেঁড়ীটার গর্ভ থেকে পোস্তর দানার মত গুলি ছড়িয়ে পড়লো উঠানের উপর।

—খা। যা খা। গেঁড়ী নিয়েও কাড়া কাড়ি, মারা-মারি গেনি ছড়িয়ে থাকা দানাগুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

মানিও কম যায়না। সে নিজে খাবে বলে কাপড় ভিজিয়ে অতদূর সাঁতরে গিয়ে মোট দেখে গেঁড়ীটা নিয়ে এসেছিল এবং ওই গেনিই যে তাকে খেতে দিলনা—এতে গেনির উপরই যত রাগটা গিয়ে পড়লো তার আর সেই মুহূর্তেই গেনির চুলের মুঠি ধরে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে শুরু করলো।

মেয়ের এই কাণ্ড দেখে ভামি, ভাছা চালের দাওয়ায় নির্বাক বসে থাকা ভূষনের দিকে তাকিয়ে বলগো, দেখলে তো বিটির তেজ! বলি এত তেজ রাখবি কুথায়? মরছিস্ তো মরবি মরবি মরবি।

নমি যেমন তালি দেওয়া কাপড়টার উপর আরো তালি দিয়ে প্রত্যহ সেলাই কার তাই করছিল। একেবারে অসহ্য না ঠেকলে ব্যাটার বোয়ের কথা কানে নেয়না। সে জানে, ও কথা বললেই ভামি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে। রয়স গুনেই হোক্ বা নাতি নাতনীদের উপর স্নেহ বশতই হোক্ ওদের কেউ মরতে বলবে তা সইতে পারেনা আহা, বেঁচে থাক্। ভগবান যখন দিয়েছে তখন মরবে কেন? সুচের সুতোটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আরো সুতো পরানো দরকার। যতটুকু সময় সুতো পরাতে লাগে সেই সময়টিতে নমি বললো, মরা মরা গাল দিস ক্যানে বৌ সময় নাই অসময় নাই।

না দিবেক নাই! শাগ, সিজা নিয়ে মারা মারি, শালুক গেঁড়ী নিয়ে কামড়া-কামড়ি—মরাই ভাল। জ্বালা জুড়ায়।

নমি আস্তে আস্তে বললো, কি কিরবি বল, বিধাতা না মাপলে পাবি কুথায় বৌ।

-বলি-বিধাতা কি ঠুটা না রগা?

এ-কথার কোনো জবাব খুজে পেলোনা নমি, তাই চুপ করেই থাকল।

ভুষনের ঘরের পাশেই বিহারীর ঘর। মাঝে ব্যবধান শুধু একটা মাটির পাঁচীল। এতকাল পাঁচীলটা দাঁড়িয়ে ছিল। বিহারীর বাপ শুকু ছিল একটা গুণী মানুষ। বন জাঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। আর নানা রকম শিকড় পাতা ফুল ফল নিয়ে এসে জমা করে রাখত। দুপয়সা রোজগার হতো এই সব বিক্রী করে, কখনো কখনো নিজেই ব্যবস্থা করত রোগের। এই কারণে শুকুকে সবাই কবরাজ বলেই ডাকত। গ্রামে নাম ছিল কবরাজ বাউরী। এই কবরাজ বাউরীরই নিয়ে আসা বীজ থেকে একটা বেলের গাছ ডাল পালা মেলে উঠেছে। বেলের শাখা প্রশাখার একটা অংশ পাঁচীল ডিঙিয়ে এ-পাশে এসে পড়েছে। পাঁচীলটাও আর পূর্বের আকারে নেই। একেই মাটির তারপর ক্রমাগত বর্ষার ধাক্কায় উপরের মাটিগুলো গলে গলে পড়তে পড়তে এক সময় খানিকটা ধসেই পড়ে গেছে। এবং ভুষণের বাড়ী আসবার একটা সহজ রাস্তা হয়ে গেছে। সেই রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়েই বিহারীর বৌ বললো। ঠুটা ক্যানে হবেক খুড়শাশ, স্যাথ যাঁয়্যয ধান মাপছে।

ভুষণ একটু নড়ে বসলো। অনেকক্ষণ সেই একই ভাবে বসে আছে। টন্-টন্ করছে পা দুটো। বিনস্ ধরে গেছে।

ভুষণকে নড়তে দেখে সবাই তাকালো তার পানে।

ভামি বললো শুনলে তো।

মানি বাপের কাছে এসে জিগ্যেস্ করলে দেখে আসব বাবা? নমির চোখ টন্-টন্ করছে। তালি দেওয়া কাপড়টা সরিয়ে রাখতে রাখতে বললো, যাবি বৈ-কি; যা।

(খ)

রামকানাই মরাই-এ হাত দেবার আগে, পাঁচটা গ্রামের সবাইকে জানানি দিয়েই মরাই ভাঙে, যে-যা নিবে নিয়ে যাও, গাঁ ভেঙে আভাবি মানুষ ছুটে বস্তা নিয়ে। সে যেন হাট বসে যায় রানকানাইএর বার বাড়ীর রাস্তায়। কেউ বসে কেউ

দাঁড়িয়ে থাকে। কখন কে ভিতরে যাবার রাস্তা পাবে তা-তো জানা নেই, তাই যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ নিজেদের সুখ দুঃখের আলোচনা করে আর চুটি টানে। ভিতরের দৃশ্য অন্য। রামকানাই এর বিস্তৃত উঠানের গায়ে গায়ে মরাই দাঁড়িয়ে, একটা শেষ হলে আরো একটায় হাত দেবার হুকুম। ঘরের মাহিন্দার থাকে মরাই এর কাছে। যারা ধান নিতে যায় তারাই বয়ে বয়ে আনে ধান, তা রাখা হয় সিমেন্ট বাঁধানো ঘরের বারাণ্ডায়। এখানের রীতি সেরে মেপে ধান দেওয়া ওজনের বালাই নেই ; নইলে ওজনে দিতে পারলে বাটুখারায় কিছুটা ফয়দা হয়। সেরের মাপেত হয়—যদি কালী ঘোষ ধান মাপে। কালী ঘোষ এক সময় রামকানাই এর সেরেস্তায় কাজ করত। বিষয় থাকলেই হবে ফৌজদারি দেওয়ানী। আর এসব তো আর কখনো সখনো নয়, তাই তদবীর তদারক করার জন্য এক জনকে রাখতেই হত রামকানাইকে। কালী এ-সব কাজে ভাল তাই রেখেছিল তাকে, কিন্তু রামকানাই-এর ব্যাটা কেনারাম এখন ম্যাট্রিক পাশটা করে যখন ঘরেই রয়েছে তখন এ-কাজটার দায়িত্ত সে নিজেই নিয়ে নিয়েছে। টাকাত বাঁচবে, আবার অভিজ্ঞতা বাড়বে, হাকিম দারোগার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। বিশেষ বিশেষ জটিল মামলা মোকদমায় অবশ্য কালীর ডাক পাড়ে আর ডাক পড়ে ধান মাপার সময়। রামকানাই একটা চৌকীর উপর সেরেস্তা বিছিয়ে বসে। পাশে থাকে কেনারাম।

—তুই বাবা শিবা ডোসের ব্যাটা না ? চোখ ঘুরিয়ে বলে রামকানাই।

—হঁ গো বাবু।

—তা বাবা কত নিবি ? কিন্তু তোর বাপের কাছ থেকে যে অনেকটা বাকী পড়ে আছে রে।

শিবার ব্যাটা অবাক হয়ে, বাকী থাকার তো কথা নয়। কিন্তু কিছু বলতে ভরসা হয়না, যদি আবার না ধান দেয় বাবু।

কেনারাম বলে, যেটা বাকী আছে সেটা উশুল করে দিয়ে নিয়ে যা।

তাই নিয়ম রামকানাই এর সেরেস্তার। নিয়ে যাও, নিবে, তবে ওই দেড়া দিতে হবে, না দিতে পারলে সুদটাও যাবে আসলে চেপে, হৃদয়হীন নয় রামকানাই যদি ধানে শোধ দিতে না পারো, দিওনা গতর তো আছে, গতরেই শোধ দিও। এক বছরে না হয়, আরেক বছরে—তবে সর্ত আছে বাবুর হুকুম না-হলে অন্যের জমিতে খাটতে যেতে পাবে না।

ভামি আবার মেয়েকে তাড়া দিল, যাবি তো যা, দাঁড়াই আছিস ক্যানে ভ্যাক্ করে !

—না যাবি নাই। বললো ভূষণ।

ভামি বললো। যাবেক নাই ক্যানে ?

ভূষণ বললো, উ চামার, ছোট লোক।

—ছোট লোকই হোক আর বড় লোকই হোক্ তাতে আমাদের কি ?

—কি বললি আমাদের কি ? সিবারে কি বৈলেছিল মনে নাই ? ভামি জবাব দিলো তা বৈললে করবে কি ? মহাজনে অমন বলেই থাকে।

ভূষণ রেগে উঠলো। চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বললো, কি বল্লি, বলেই থাকে। উয়াদের কুয়া থাক্যা জল লিতে গেলে বলে থাকে জল-ট কমে যাবেক ? সাত মন ধান দেড়ীতে নিয়ে একটা হালের পুরা চাষ গতরে খাট্যা তুলে দেওয়ার পরও বলে থাকে, শোধ দিতে না-পারলে, বৌ-বিটিকে বন্ধক রাখ্যা যাবার কথা ? আমি বলছি তুই যাবি নাই মানি।

—হঁ যাবেক। বৌ-বিটি খাত্যা দেবার অক্কেল নাই যার তার আবার মান অপমান কি ?

এবার উঠে দাঁড়াল ভূষণ। চিৎকার করে বললো, চুপ্ চুপ্ কর মাগি।

এত যে তেজ সকাল থেকে কথায় বার্তায় চলনে বলনে প্রকাশ পাচ্ছিনু এবং ক্ষণকাল পূর্বেও মেয়ের উপর যে অধিকার প্রকাশ পাচ্ছিল, সেই তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ মিলিয়ে গিয়ে নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করে বললো, চুপ করে থাকতেই ত চাই, কিন্তু পারি কই ? এই যে কচি কচি মুখগলা আচল ধরে ধরে বলে (যাওয়া আসা) ওই যে বুড়ী শাশুড়ী—আর বলতে পারলনা ভামি, গলাটা ধরে এলো, চোখের পাতা দুটো ভিজে উঠলো জলে।

নমির কথা বলার দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন সে যেন ফালতু ? শুধু বেঁচে থেকে বোঝা বাড়ানো। তাই ত বটে, নিজের জীবনটাই নিজের কাছে একটা দায় হয়ে ঠেকেছে। কতদিন আর এমনি ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে হবে কে জানে ?

—কি কৈরব বল্ বৌ, মরণ যে হয়না। টেনে টেনে বললো নমি।

—মরতে তো আমি বলি নাই, কথা টাঙ্গা আনো ক্যানে ?

নমি বললো, আমি ও বলি নাই তুই মরতে বলেছিস্ আমারই কেমন ঘিন্না লাগে বৈচ্যে থাকতে। কি কৈরব, লারি যে··· চলতে পায়ে জোর নাই।

নমি উঠতে গিয়ে ওই খানেই শুয়ে পড়লো।

ভামি দেখিয়েও দেখলনা।

মানি এখন এখান থেকে সরে পড়তে চায়। এমনি এমনি বেরিয়ে গেলে পঞ্চাশ রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে মা কে-কুথা যাবি, ক্যানে যাবি, কি হবেক যাঁয়্যা এমনি সব নানা প্রশ্ন, আবার ঘরে থাকতেও মন চায়না। খালি গাল মন্দ আর কান্না, কাটি শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে যায়, মনটা কেমন খচ-খচ করে। ওর হাসতে ইচ্ছা হয়, খেলতে ইচ্ছা, নেহাৎ তাও যদি না হয় তবে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারা? তারও উপায় নেই। একটা উপায় মিলেছে—গোগলি গুলি নিয়ে যদি নাপিত বৌকে পৌছে দিয়ে আসে হয়ত এক বাটি ভাতের ফ্যানও পেতে পারে। সেদিন মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে এক আচল শুশনি শাক্ দিয়ে এসেছিল বামুন ঘরে। কাউকে বলেনি-এক পেট ফ্যান খেয়েছিল মানি। সেদিনটা মন্দ কাটেনি যদি না দেয় নাপিত বৌ তবে চাইবে মানি। চাইলে কি আর না দেয় এমনিতেই তো হয় গোরুকে দেয় নয় লাউ গাছের গোড়ায় ঢেলে দেয়, আর মানিকে দিবেনা? ফ্যানের ভাবনায় রসনায় জল এলো মানির।

—গোগলিগুলা দিয়ে আইসব মা? জিগ্যেস করলো মানি।

—যা। দাম দিবেক, নিয়ে আসবি। বললো ভামি। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চালকে দাম বলে এরা।

—যদি না দ্যায়?

—দিবেক নাই ক্যানে, দিবেক।

মানি মনে মনে খুশিই হলো। দাম চাইবে সে বলবে, মা দাম দিতে বলেছে, আর তা যদি না দ্যায় তবে দুটি ভাতই চাইবে সে। ভাতগুলি সেখানে বসেই খেয়ে নিয়ে—এসে বলে দিবে, দাম দ্যায়নি। —যাছি তবে মা। বললো মানি।

(গ)

ভূষণের হঠাৎ মনে হলো সে অনেকক্ষণ ধূম পান করেনি, মনে হতেই তৎক্ষণাৎ ধূম পানের পিপাসাটা তীব্র ভাবে অনুভূত হওয়ায়—একবার টাঁকটা এক বার কানের উপরের খাপটায় একটা আধ-খাওয়া বিড়ির বান্ধনে হাত চালিয়েও যখন পাওয়া গেলনা। এখন একবার রাধা মুদির দোকানে যাওয়াই স্থির করলো। ঘরের তিক্ত আবহাওয়াটা যখন অসহ্য হয়ে উঠে, তখন রাধার দোকানের দরজার এক পাশে গিয়েই বসে ভূষণ। রাধার দোকানে খদ্দের না থাকলে রাধা কিছুটা গল্প-গুজব করে। সেই ফাঁকে হয়ত বিড়ি একটা ধরায়। তার খানিকটা

টেনে নিয়ে বাকা অংশটা ভূষনকে ছুড়ে দিয়ে বলে, যাবার সময় এই বস্তাগুলা অলপ বনাড়ে ঝুড়ে ওই মাচানে তুলে দিয়ে যাবি ভূষণ।

তা স্থায় ভূষণ।

বাউরী পাড়া থেকে বেরিয়ে কুলি রাস্তায় পা দিলেই বাঁ দিকে রাধার দোকান আর ডান দিকে তাকালেই নজরে পড়বে রামকানাই-এর ন আনা বাড়ীটা।

রাধু মুদির দোকানই যদিও গন্তব্য স্থান ছিল ভূষণের—সেটাও আবার সামান্য আধ খাওয়া বিড়ির জন্য, কিন্তু কেনারামের ঘরের দরজায় একটা জটলা দেখে সেই থানে গিয়েই দাঁড়াল সে।

এইটাই হয়ত মানব চরিত্র। মানুষ মানুষকে টানে।

ব্যোমকেশ মাষ্টারকে সবাই চেনে এরা। আশপাশের পাঁচ সাতটা গ্রামের মানুষ ব্যোমকেশ মাষ্টারের পরিচিত। সেই যে বছর যুদ্ধ হলো প্রেসিডেন্ট বললো চীন দেশ আক্রমণ করেছে, সেই বছর পুলিশ হণো হয়ে খুজে বেড়িয়েছে ব্যোমকেশকে। প্রেসিডেন্ট নাম পাঠিয়ে দিয়েছিল ব্যোমকেশ মাস্টার পাঠশালের মাস্টার হলে কি হবে তলে তলে নাকি চীনের পক্ষে কাজ করছিল। পুলিশ এসে তোলপাড় করেছিল গ্রামটাকে। পাবে কোথায়? আজ এ ঘর তো কাল আরেক ঘর, আজ এক গাঁয়ে তো কাল আরেক গাঁয়ে। লুকিয়ে রেখেছিল এই পাঁচ-সাতটা গ্রামের গরীব মানুষরা। বিহারীর ঘরেও এক রাত ছিল ব্যোমকেশ। একথা জানত ভূষণ। কিন্তু কাউকে বলেনি।

তারপর আরো চেনার কারণ আছে।

শীতের রাত্রিটার পর সূর্য্যের উত্তাপ গরীব মানুষগুলির দেহটাকে তপ্ত করে দেয়-বুকের কাঁপুনি থামে, ঠিক তেমনি সে বছর ডর-ভয়ে ধুক্-ধুকানি দেহের ভিতরের প্রাণটা তপ্ত হয়ে উঠেছিল-সে-বছর ওই মানুষটাই বলেছিল, লুকানো জমি যুদ্ধে বের করে বিলি করতে হবে।

সেদিন দেখেছিল মানুষদের সাহস।

সেই ব্যোমকেশ মাস্টারও এসে দাঁড়িয়েছে যখন তখন শুনতে হয় মাস্টারের কথা—কি চলে।

এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ভূষণ।

কিন্তু ও যা চায় তাই দিবি নাকি তোরা? চিৎকার করে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল ব্যোমকেশ।

বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

—কিন্তুক ম্যাস্টার পেট যে—কে যেন বললো জটলার মধ্যিখান থেকে। কানে এলো কথাটা মাত্র।

—তাই বলে সাদা কাগজে টিপ্ দিবি?

—কিন্তুক কি কৈরব বল।

—কিন্তু তারপর? যা নিয়ে যাবি, তা তো দুদিনেই ফুরাবে, তারপর আবার এই খানে এসে দাঁড়াবি! এইটাই কি বাঁচার উপায়? একা তো তোদের এই অবস্থা না—এই ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষের এই অবস্থা। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আছে, ব্লক অফিস আছে সেখানে বি, ডি, ও আছে—সদরের মালিকেরা আছে তাদের কাছে যেতে হবে। দাবি করতে হবে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। বললো ব্যোমকেশ।

ভাদাসপুরের রাখাল বাগ্দীর বৌ কাদি ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। ধান না পেলে আবার তাকে অতটা রাস্তা ফিরে যেতে হবে এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হবে কতদিন, কে জানে, তাই বললো, হঁ দে সবাই ত সব দিবেক। বলে, ঘরে মরে পড়ে থাকলে কেউ উকি মারে না—এই তো উ বছরে এমনি ভাদরেই সুঁদি গেল—সুঁদির অত বড়ো জোয়ান ব্যাটার বৌ-টা—সবাই সব দিবেক।

উপর কুলির কালিপদ বললো, শালা রিলিফের গমই প্রেসিডেন্ট খায়না, আবার ধান দিবেক।

ব্যোমকেশ মাস্টার বললো, জানিস তো না কাঁদলে ছেলের মা ও ছেলেকে দুধ দেয় না। তবে আমি কাঁদিতে বলিনা, আমি বলি-চল, দল বেঁধে আমরা যাই প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে বলি, এই ইউনিয়নের এই অভাবের দিনে খাবার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল মানুষগুলি। কি তারা করবে? বিহারীও ছিল ওদের মধ্যে, সেই বিহারীই বললো, চল সব, চল।

ওদের পিছনে পিছনে ভূষণও গেলো পায়ে পায়ে।

শোলু রায় আজ বিশ বছর ধরে এই ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। এখন বোর্ডের মেম্বররা আর কেউ নেই। কেউ মরে গেছে। কেউ এ গ্রাম থেকে অন্যত্র বস-বাস করেছে, কেউ আবার বোর্ডের কাজে কর্মে কোনো উৎসাহ না পেয়ে বসে পড়েছে। এখন বোর্ড বলতে শোলু রায়। মানেই বোর্ড। এ ভালোই হয়েছে শোলু রায়ের পক্ষে। অবশ্য বলে। এটা হয়েছে, বিড়ালের ছুচো গেলা, না-পারছে ফেলতে, না-পারছে গিলতে।

এ কথা ঠিক বিশ্বাস করে না অনেকেই, বিশেষ করে সতীশ চক্রবর্তী। সে বলে, বোর্ড হাত ছাড়া হয়ে গেলে চলবে? আমরা তো দেখেছি হে-কি ছিল শোলু রায়ের। থাকবার মধ্যে বাপের একটা বাড়ী। সেই বাড়ী এখন আছে?

তা অবশ্য নেই। বাপের বাড়ীটাকে মেজে ঘসে নিয়ে তার উপর আরো একটা ছাদ তুলেছে। জমিও করেছে। সরকারের খাস জমির হিসাব ওর কাছে। সেখানে থেকে যা আয় হয় তা শোলু রায়ের তহবীলেই জমা থাকে। ট্যাক্স থেকে চৌকিদারদের মাইনা পাঁচ সাত টাকা দেয়, আবার এই চৌকিদাররাই তার জমিতে চাষ করে। ঘর পাহারা দেয়, ফাল ফরমাস খাটে।

স্বভাবটা যাই হোক শোলুর, মুখ খুব মিষ্টি। মিষ্টি করে কথা বলতে জানে।

ঘরের বাইরে হৈ চৈ দেখে ঘরের মধ্যিখানে বসে থেকে কারণটা আর বুঝতে দেরী হয়না তার। আজ বিশ-বছর এই কাণ্ড দেখছে। তবু বসে থাকলো শোলু রায়।

বাইরের থেকে নন্দা চৌকিদার এসে খবর দিল, সবাই প্রেসিডেণ্টকে কি বলবে।

—কে আছে রে নন্দা? দে রে গড়গড়াটা। বললো শোলু রায়।

—আগে যতনেই এসো, তারপর তামাকে টানবে। রান্না ঘরের দরজা থেকেই বললো মমতার মা। মমতার মায়ের ভয় করে—এই সব মানুষদের। তারপর আবার নোতুন জামাই ঘরে রয়েছে।

মমতা এ-সব দেখা সহ্য হয়ে গেছে, বরং ও খানিকটা আমোদ পাই; গর্ব অনুভব করে।

আজ তার স্বামীও এখানে আছে—বেশ ভালোই হয়েছে, দেখে যাক্ ওর বাপের ক্ষমতাটা।

মমতা বললো, থাক্না দাঁড়িয়ে কি হয়েছে কি?

গড়গড়াটা এনে দিয়ে নন্দ বললো, ম্যাস্টর বাবু বাইরে যেতে চললেন।

মমতা চললো; বললেই যেতে হবে নাকি? মাস্টার বাবুর চাকর নাকি বাবা? শোলু রায় মেয়ের কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললো, ব্যোমকেশ?

হাঁ।

একটা দলকে ব্যোমকেশ মাস্টারের সঙ্গে বাড়ীর বাইরে হল্লা করতে

দেখে ব্যাপারটা আর বুঝতে বাকী থাকেনা—হাঙ্গামাটা সৃষ্টি করেছে ব্যোমকেশই! লাজ নাই ছোঁড়াটার। এই তো গত বছরই পাশ-পাশাড়ি গ্রামের ক্ষুধা-টাকে নিয়ে ব্লক অফিসে হাজির হয়েছিল। এবং ব্লক থেকে সদরে যাবারও মতলব ভেজেছিল। কিন্তু তার আগেই একটা ধান ডাকাতি কেসে জড়িয়ে পড়ে নয় মাস পর খালাস পেয়ে এসেছে।

দম নিয়ে গড়গড়ার শেষ টান টেনে মাটিতেই নলটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো শোলু রায়। নন্দ গিয়ে বৈঠকখানাটা খুলে দিল। এই টাই বোর্ডের অফিসও।

মমতা নন্দকে ডেকে বললো, বাবার কাছে কাছে থাকিস।

শোলু রায়ের বৈঠকখানার অফিসটা খুলতেই হুড়-মুড় করে মানুষগুলি এগিয়ে গেলে। ওদের সবারই সামনে ব্যোমকেশ।

শোলু রায়ই এগিয়ে বসে ব্যোমকেশ জড়িয়ে ধরে বললেন, এসো এসো বাবা তুমি ফিরে এসেছ শুনেছি কিন্তু এখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তা তো নদা গিয়ে বললো না। আর দাঁড়িয়েই বা থাকা কেন? এঁ্যা? তুমি কি পর নাকি? বাড়ীতে যেতে পারতে, কাকীমা আছে, মমতা শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে। জামাই রয়েছে—

ব্যোমকেশ বললো, এখন ও-সব কথা থাক্ এরা এসেছে আপনার কাছে।

মনের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল শোলুর। একটুও পালটায় নি নয় মাসে ঘানি টেনে।

বুঝি তো আর যাবেই বা কার এ কাছে। আছে রামকানাই, তবে ওর যা সুদ, আমিও ওর কাছে যেতে বলি না, বুঝেছ? কিন্তু যেতে ত আপনিই ধার্য্য করেছেন। বললো ব্যোমকেশ। শোলু রায় এক গাল হেসে বললেন, যারে বাবা আমারই কি কষ্ট হয় না কিন্তু করি কি? কোনোই যে উপায় দেখতে পাইনা।

—ঘরবাড়ির দাম কি নাই?

—থাকলে ত বিলিই হত বাবা। তবে হ্যা, যাব সদরে বলব গিয়ে তোমাদের দাবির কথা।

ব্যোমকেশের মুখটা শক্ত হয়ে গেল।

ওই মুখটাকেই ভয় শোলু রায়ের।

ব্যোমকেশ বললো, চলুন বলবেন ওই কথা ওদের।

—তারপর ?

—তারপর ওদের রাস্তা ওরাই বের করে নিবে।

শোলু রায়কে আসতে হলো ভুখা মানুষগুলির কাছে। বললো যা একটু আগেই বলেছিল ব্যোমকেশকে।

বিশ্বাস রাখো তোমরা, আমি আজই যাব সদরে, বলব তোমাদের কথা—

ভীড়ের মাঝখান থেকেই বিহারী বলে উঠলো, মিষ্টি কথায় কি ক্ষিদে মিটবেক ?

আবার সেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। এখন কি করার আছে।

ভীড় দেখেই ভীড় বাড়ে। মানুষ মানুষকে টানে। যে ভদ্র মানুষদের অবস্থা এদের মত এখনো অনাবৃত হয়নি তারাও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যোমকেশ কি বলে তাই শুনতে চায়।

একটা ছোট খাটো সভা। সমনে এলো ব্যোমকেশ। বললো, সময় আমারা দিব, তবে এটাও জানিয়ে দিতে চাই গাঁয়ের গরীব মানুষদের উপোসী রেখে চোরা চালাণের ব্যবসা চলতে দেওয়া হবেনা। আর এও বলে রাখছি দুটো দিন পর চাল বা গম না পাওয়া গেলে আমরা আমাদের পথ বেছে নিব। যদি ব্লকে যেতে হয়—দল বেঁধে যাব, যদি ঘেরাও করতে হয় তাই করব।

চাল বা গম না পাওয়া গেলেও, পাবার একটা রাস্তা মিলেছে।

(ঘ)

পড়ন্ত বেলায় মানি শুধু হাতে ফিরতেই ভামি চোখ পাকিয়ে বললো, এই যে ঘরে ফিরেছে রাধা, বলি এতক্ষণ ছিলি কুথায় ? কুথায় ছিলি বল।

উত্তরটা আর শোনার প্রয়োজন মনে করলোনা ভামি। হাতের কাছে একটা চেলা কাঠ পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে মারতে যেতেই নমি বললো, আহা মারিসনা বৌ ! অত বড়ো বিটিকে কি মারে।

---না মারবেক নাই আদর করবেক, সুয়াগ করবেক ! মরুক মরে যাক্ ! হাঁয়ে হাঁয়ে কহলুম দাম নিয়ে আসবি, মানুষটা আজ দুটা দিন লিড়া-কাটা উপাস দিয়ে আছে—মাড় ভাত কৈর‍্যা দিব—তা লয় দুলালি বিটি দান কৈর‍্যা আলেন।

দান সে করেনি। নাপিত বৌ বলেছিল চাল লিবি, না খাবি ? খাবার

কথায় জিবে জল এসেছিল মানির। অনেক দিন ডাল দিয়ে ভাত খায়নি—যদি এক পাতা পাওয়া যায় তাই খাবার কথাটাই বলেছিল মানি।

মায়ের উগ্র মূর্তি দেখে পালিয়ে যাবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে—এই যখন ভাবছে মানি তখনই পাড়ার লোকগুলি ঘরে ফিরল।

(৬)

ভাবনার যে একটা দাহিকা শক্তি আছে এবং তা যে ক্রমশই সোনার বর্ণকে কালি করে দিয়ে জীবন সম্পর্কে একটা হতাশা সৃষ্টি করে তা সাবির দিকে তাকালে মনে হয়। এইত চব্বিশ পঁচিশ বয়স। এই বয়সেই কি হয়েছে তার চেহারা। নিজের দেহটার দিকে তাকালে নিজেরই কেমন ঘৃণা হয়। দেহটার শ্রী ফুটে উঠবে কি করে? পেট ভরে অন্ততঃ এক বেলাও যদি খেতে পেতো সাবি! সেদিন পুকুর ঘাটে বিঁদির সঙ্গে দেখা হতেই বিঁদি বলেছিল কি ইন্‌ন্যা গেইছিস সাবি। সাবি বলেছিল, পেটে ভাত না পড়লে আর কি হবেক বল।

খাবার আবার অভাব লো। পেট ভরাবার কি উপায় নাই মনে করিস?

—কি উপায়?

বৈদ্যে দিতে হয় না লো। পেটে যখন টান পড়ে তখন আপনিই বিরায়। এই ত বললি—ত্থাখ ইবারে হয় কিনা।

আর কোনো বলেনি সাবি।

মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে সে উপায়ের পাথটা উকি মারে। অনেক বার সে উপায়টা চুপি চুপি এসে হাজির হয়। মু আঁধারি হলেই বিঁদি বাবুদের তরকারি বাগানের পাশের ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে এ-পাড়ায় আসে। বিহারীর ঘরের দরজায় চাপা স্বরে ডাকে, বৌ আছিস না কি?

সাবি ঘরের মধ্যে একটা খাটিয়ায় শুয়ে থাকে বাঁচবার হাতছানি, শরীরটাকে রাখবার উপায়। উঠবে কিনা ভাবে, একবার মনে হয় উঠে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসে বিঁদিকে খাটিয়া থেকে একটা পা নামায়, আবার তুলে নেয়। রামকানাই এর ব্যাটা কেনারামের চোখে নাকি সাবির রূপ ধরা পড়েছে। একবার বিঁদির ঘরে নিয়ে যাবে বিঁদি। কেনারামের কাছে শুধু দাঁড়াবে।

তখনই আবার বুকটা কেঁপে উঠে। কোনো উত্তর দিতে পারেনা সাবি।

কিন্তু বিঁদি আবার ডাক দেয়। তেমনি চাপা স্বর সাবি বৌ! ও সাবি বৌ!

সাবির চোখ দিয়ে জাল গড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে উঠে এসে দরজায় দাঁড়ায়। চুপি চুপি বলে, আজ যাত্যা লারব গো। কথাটা বলতে বলতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে সাবির।

—ক্যানে লো? বাঁচতে সাধ হয়না?

হয়, হয়,—কিন্তু সে কথা না বলে বললো, অন্য দিন পিশি। কথাটা বলেই দরজাটা বন্ধ করে ছ্যায় সাবি।

সেদিনও রাতের আঁধারে এলো বিঁদি। বিহারী আজ কাল প্রায়ই ঘরে থাকেনা। কোথায় যায়, তাও বলে যায়না। যাবার সময় একটা কথাই বলে যায় সাবধানে থাকিস বৌ-লাবি বৌ আছিস?

সাবি জবাব দিবে কি দেবেনা তাই ভাবতে যে-টুকু সময় লাগে, সেই টুকু সময়ের মাধ্যই বিঁদি ভিতরে এসেই বললো, এই সব লিয়ে কি বাইরে দাঁড়াই থাকা যায় বৌ, লে এই চাল গুলা রাখ্যা দে। আর এই শাড়িট পর।

আচলে লুকানো চালগুলি সাবধানে মাটিতে ঢেলে দিতেই সাবি লুব্ধ দৃষ্টিতে ধব্-ধবে চালগুলির দিকে তাকিয়ে থাকলো।

—তুই ছিলি পাড়ার সেরা বৌ, রূপ যেমনি তেমনি শরীরের বাঁধন—চোখ পড়লে আর ফিরানো যা-য় নাই। আর সেই রূপ কিনা—লে রাখ্যা দে চালগুলা। আর এই শাড়িটা পরে নে।

সাবি চালগুলি মুঠো ভরে ধরলো, খানিক আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আবার ছেড়ে দিল। আবার নিলো আবার ফেলে দিলো। তারপর শেষে বললো, ইগলান নিয়ে যাও গো।

—মরবি যে-লো!

—না গো আমার ডর লাগছে।

—পহিল পহিল অমন সবারই হয়। বেশ ত চাল লিলে যদি জানা জানি হয়, টাকাই রাখ।

—না, তুমি নিয়ে যাও। আমি যাব নাই।

শাড়িটা ছুড়ে দিলো সাবি।

(চ)

রাত আসে। জীবন্ত মানুষগুলি পড়ে থাকে মরার মত। গোবর মাটির ধুলো সর্বাঙ্গে জড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে গভীর নিঃশ্বাসে রাতের বাতাস

ভারী হয়ে উঠে। গোটা পাড়াটাই নীরবতার গভীরে আত্মগোপন করে। এক মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় যখন মুরুলি গ্রামে থাকে। সে আপন মনেই, আপনায় কুড়েটার দরজায় বসে গান গায়। সংসারে একলাই ও বাপকে ত্যাখেনি —তবে একটা ছিল ঠিকই, মাকে দেখেছে। এখনো কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড ছবি তার মনে গাঁথা আছে। মায়ের কোলে চড়ে সারা গ্রামটাই ঘুরে বেড়াত ওর মা। বাবুদের ঘরে গিয়ে দরজাটার কাছে মুরুলিকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে বলত। ছিলাটকে ছুটি দিবে গো! আরো মনে আছে-যখন কারো বাড়ীতে খাওয়ান দাওয়ান হতো বা বিয়েতে কি শ্রাদ্ধে ভোজের আয়োজন হত-সেদিন, মায়ের সঙ্গে যেত পাতা কুড়োতে। বাপ্‌রে—পাতা কুড়োনো ত ছিলনা, ছিল পাতা কাড়াকাড়ি! এই সব ঘটনার সঙ্গে-একটা ঘটনা এখনো মনে গাঁথা আছে। এমনি একটা ভোজে পাতা কুড়োতে গিয়েই মার খেয়েছিল ওর মা, রায় বাবুদের ঘরে ভোজ। নিমন্ত্রিতরা খেয়ে উঠে যেতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল বাউরী মেয়েরা। ওদের সঙ্গে ওর মাও ছিল,—পদ রায় একটা ডাণ্ডা নিয়ে মেরেছিল মাকে, কেঁদে উঠেছিল মুরুলি। কেন মারলো গো? কেন মারলো ওদেরই একজন বলেছিল, মার তো খাবেকই এখনো বাবুদের যাওয়া হয় নাই, আর যাঁয্যা ছুয়ে দিলি সেদিন বুঝেছিল বাবুদিকে ছুতে নাই!

এর পরে আর বেশীদিন বাঁচেনি ওর মা।

মা মরতেই মুরুলিও বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথায় ছিল কেউ জানতনা। পাড়ার লোকগুলো ওকে ভুলেই গিয়েছিল, তারপর একদিন হঠাৎই ফিরে যখন এসেছিল, তখন সে আর আগের দিনের মুরুলি ছিলনা। মুরুলি তখন মরদ লোক। রাতিমত—পুরুষ। মাথায় এক মাথা চুল নেমেছে ঘাড়ের উপর, হাতে একটা এক তারা, আর কণ্ঠে গান।

ও মন ভুলবি কেমন করে
বাউরী ঘরের বৌ বিটিদের—
পাতা কুড়া-এও প্যাট্‌ ভরে

এখন গ্রামে থাকলেও ওর ঘরটায় বড়ো একটা আসেনা কখনো রাতটা কাটিয়ে দেয় গ্রামের বাইরে পাকা-সড়কের ধারে সুভাষ ঠাকুরের দোকানের চালাটায়। কখনো আবার অন্য কোথাও।

সুভাষ ঠাকুর একদিন বলেছিল, ঘর আছে ও, ঘরে যাসনা কেন রে?

মুরুলি বলেছিল, তুমি মাইরি, ইস্কুলে পড় নাই।

সুভাষ বলেছিল, তুই কি করে জানলি ?

— ইস্কুলে পড়লে কেউ অমন কথা বলে ? শালা, বৌ-নাই ব্যাটা বিটি নাই -আর ঘর থাকবেক ? লাও চা কর দেখি। সুভাষ ওর কথার ধরন দেখে লত, এখন মুখে জল দিই নাই, আর তোকে চা করে দিই।

মুরুলি সুভাষের কথায় আমোদ অনুভব করত।

বলি, তুমিও ত খাবে, না খাবে নাই ?

সুভাষের মনটা নরম হতো। সে বলত, বেশ চা খাবি ত, উনোনটা পরিস্কার রে আঁচ দে, আমি ততক্ষণ পুকুর থেকে আসি।

এর পর থেকে এখানে থাকলেই সুভাষের দোকানে আসার আগেই ও নোনের গত দিনের ছাই পরিষ্কার করে, আঁচ দিয়ে রাখে কোনো কোনো দিন াবার রাতটা অন্য কোথাও কাটিয়ে এসে সুভাষ ঠাকুরের উনোনটার অনতি রে বসে বলে, ক্যামন আছ ঠাকুর ?

সুভাষ মাথাটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে, কুথায় মরতে গেছিলি রে ?

মুরুলি বেশ গম্ভীর ভাবেই জবাব দেয়, মৈরতে ক্যানে যাব হে, গায়েন শিখতে াইছিলুম। বেড়ে গাইলেক মাইরি ঠাকুর! তুমি যদি শুনতে—ত ঠিক বলছি াকুর ক্ষ্যাপে যাথ্যা।

—তুই ত শিখলি ?

—শুনবে ?

—পয়সা চাইবি না।

—মদের দামটা ?

—দোকানে বিক্রী আছে ? তার উপর আবার একটা বাস আছছে না।

—তবে টুকচা চাঁ দিও ৮ 'না' কৈরণা মাইরি।

সুভাষ ঠাকুর হেসে উঠে।

আচ্ছা।

এমনি গান গেয়ে দু চার পয়সা যা পায়, তাই দিয়ে আসে শুড়ি দোকানে। তারপর যতক্ষণ না ঘুমোয় ততক্ষণ গান করে মুরুলি।

এই ক'টা দিন হলো গাঁয়ে এসেছে মুরুলি। পাড়ার দিকে গিয়ে কে কে বেঁচে মাছে খবর নিয়ে এসেছে, আরো কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছে—ওই বেঁচে থাকার াঙ্গে যে সংবাদগুলো যুক্ত হয়ে আছে।

সন্ধ্যার দিকে সুভাষ ঠাকুরের দোকান দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো মুরুলি।

মুরুলিকে দেখে সুভাষ ঠাকুর বললো, চা আর হবে না। —এ্যাই গ্যাখ, আমি কি চা খাত্যাই আসি নাকি? তুমি মাইরি—

আজ মনটা বড়ো ভারী হয়ে আছে মুরুলির। বাবুরা নাকি পুকুরে নামতে মানা করে দিয়েছে। পুকুর থেকে গুগলি তুলেছিল বাউরীদের বৌ-বিটিরা—হুকুম হয়েছে গুগলি তুলাও চলবেনা। এ কেমন হুকুম। বুকে ব্যথা পেয়েছিল মুরুলি। আর সেই ব্যথা—একটা গানে রূপান্তরিত হওয়ার আনন্দে চলে এসেছিল সুভাষের কাছে। —বেশ বল। কিন্তু পয়সা চাইবিনা, তা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।

—বলছি এক-ট গায়েন কৈরব, শুনবে ত। বললো মুরুলি।

—পয়সা চাইবি না ত।

—না।

—বেশ তবে গা।

—আমি বাঁধেছি, শুণ :—

একতারার তারটায় আঙুল চালিয়ে সুরটা বেঁধে নিলো কণ্ঠের সঙ্গে। তারপর একতারাটি কানের কছে ধরে গাইতে শুরু করলো—

কি সুখেই রাখ্যাছ মাইরি হরি।

—শুনছ?

—শুনছি, গা।

কি সুখেই রাখ্যাছ মাইরি হরি।
কারু বেলায় দুধ ভাত, কারু বেলায় গোগোলি।
তাও আবার নিতে মানা
ভবা দ্বিচে ছিচে মরি॥
কি সুখেই রাখ্যাছ মাইরি হরি॥

গান শুনে হেসে উঠলো সুভাষ। বললো যা শুনিয়ে দিয়ে আয় বাবুদের।

—যাব।

(ছ)

চারটা দিন পর আবার জড়ো হলো অভাবী মানুষরা। এবার খবর নিয়ে এসেছে রামপুর ইউনিয়নে গম গেছে, তবে এখানে অসবেনা কেন?

বাস ষ্টাণ্ডে শোলু রায় সদর থেকে এসে নামতেই মানুষগুলি ছেঁকে ধরে ওই প্রশ্ন করলো।

—আসবে না কেন?

—তার জবাব কি আমি দিব?

মানুষগুলির মধ্যে এক জন বলে উঠল, তাহলে কে দিবে? শোলুরায় একবার মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে বললো, সে জবাব যাদের দেবার দিবে। তবে হ্যা,- আমি বলতে পারি চেষ্টা করছি।

ভীড়ের মধ্যেই একটা কথা উঠলো-লরী গ্রামে এসেছিল। শোলু রায় জিজ্ঞেস্ করলেন, কে বললে লরী এসেছিল? — যারা দেখেছে। জবাব দিলো ব্যোমকেশ।

শোলু রায় বললেন, এসেছিল। তবে এ গ্রামের জন্য নয়। তবে হ্যাঁ, এ গ্রামের জন্যও আসবে।

ক্রমশঃই যেন উত্তেজনা বড়ছে। মাঝে মাঝে ফুলে উঠছে জনতা।

—আসবে আসবেই ত শুনছি; কবে আসবে?

—ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। বললেন শোলু রায়।

বিহারী সামনে এগিয়ে এসে বললো, ধৈায্য আর ধরে রাখতে পারছি কই?

—তা আর কি করবি বল। পরের হাতে ধন। সরকারের ঘর থেকে হুকুম বের করা কি সহজ কাজ। দেখছিস্ ত তোদের জন্যে ছোটা-ছুটি করছি। বেশ সমীহ ভাবেই বললেন শোলুরায়।

জমায়েৎটার মধ্যে যে-উত্তেজনা একটু আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল শোলু রায়ের ওই মিষ্টি কথায় তা যেন অনেটা নিস্তেজ হয়ে গেলো। কি আর করার আছে? যারা জমায়েৎ হয়েছিল একটা আশা নিয়ে তাদের অনেকে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করলো। ফিরে যেতেও মন চায় না। ঘরের কান্না-কান্না আবহাওয়াটায় মন পোড়ায়।

কিন্তু উপায় একটা করতেই হবে—সবারই মনে এই চিন্তা।

ব্যোমকেশ সকলকে উদ্দেশ্য করেই বললো, বন্ধুগণ, আমরা যতই সয়ে যাই ততই আমাদের উপর অত্যাচার বাড়ে। আমরা বিশ্বাস করিনা যে, গম নেই। আসলে যে-টা নেই সেটা হলো আমাদের আদায় করে নেবার শক্তি। আমরা ওদের জানিয়ে দিয়েছি, আমরা বিছিন্ন আমরা দুর্বল। এই দুর্বলতা আমাদের কাটাতে হবে। সবাইকে এক সঙ্গে বলতে হবে আমরা দুর্বল নই, আমরা আমরা না খেয়ে মরতে রাজী নই। আমরা মরব না। না! না!! না!!!

না! না! না!

শুয়ে শুয়ে ওই একটা শব্দই বার বার আওড়াতে লাগলো ভূষণ। যতবার বলে, ততবারই হৃদয়টা জ্বলে উঠে। বুকটা ফুলে ওঠে। দুঃখের অনুভূতির রূপান্তর ঘটে। একটা বল পায়। নিজেকে মনে হয় শক্তিমান। একটা অভূতপূর্ব চিন্তা যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে আসে, আস্তে উঠে এসে তার ইচ্ছা শক্তির উপর প্রভাব ফেলে। আর তখনই মনে হয় ভূষণ নামক মানুষটি নিজেরে দুর্বল মনে করে মরতে চলেছে, অথচ ইচ্ছা করলে সে বাঁচতে পারে, অন্তত বাঁচার একটা পথ বের করতে পারে।

—ঘুমালী নাকি খুড়া? ঘরের বেল গাছটার পাশে ভাঙা দেয়ালটার ওপাশ থেকে জিগ্যেস্ করলো বিহারী।

রাত্রিটা অন্ধকার।

—না রে' আয়। বললো ভূষণ।

ফস্ করে একটা দেয়াশেলাই-এর কাঠি জ্বাললো বিহারী। অন্ধকারটা ক্ষণ—কালের জন্য হলেও অন্ধকারের ঘনত্ব কেটে গেলো।

ভূষণের উঠানে এসে দাঁড়ালো বিহারী।

ভামিও এসে দাঁড়ালো ছেলেটাকে কোলে নিয়ে।

—কি হৈল রে? জিগ্যেস্ করলো ভূষণ।

—যাওয়াই ঠিক হৈল। উ শালা কারু মুখ চ্যাপ্যা হার থাকব না নাই। লিজরাই যাব। ব্লকে না পাই, সদরে। —ব্লকে কি ধান-চাল হয় নাকি? জিগ্যেস্ করলো ভামি। কেমন বেখাপ্পা প্রশ্ন। চটে উঠল ভূষণ।

—তুই যখন বুঝিসনা ই—সোব তখন ঠোঁট নাড়িস্ ক্যানে?

ভামিও কম যায়না, বলতে গেলে সেইত ধুক-ধুক করা প্রাণটাকে এখনো থামতে দেয়নি আর বলে কিনা ভামি বোঝেনা। সে বললো, বেশী বুঝ ত তুমরা, তাই উপাস দিছ। বিহারী বললো, চোরের রাজত্বে করবি কি, বল! —বলি চোরকে ধরে মারতে পারনে এতগলা মরদে? হাত উঠে শুধু মাগ্কে পিটাতে।

মনের জ্বালাতেই কথাগুলি বেরিয়ে এলে ভামির মুখ থেকে। বিহারী

বললো, আছাড় না খাল্যা ত চলতে শিখেনা খুড়ী। ইবারে এক-ট উপায় হবেক খুড়ী।

ভূষণ খাটিয়া থেকে উঠে বসে বললো, বৈস্।

বসলো বিহারী।

—চল দেখি ইবারে– কি বুঝছিস!

বিহারী বললো, বুঝব আবার কি? বাঁচতে যদি লয়, তবে উঠে দাঁড়াতে হবেক। উপায় আমাদের হাতেই।

(ঝ)

হাওয়াটা উত্তপ্ত—তারই আঁচ পায় রাম কানাই, কেনারাম, শোলু রায় আর সতীশ হাজারা। ইদানীং সতীশের ব্যবসাটায় একটা মন্দগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে মানুষগুলি দুবেলা খাবার জন্য ধর্না দিত সতীশের দরজায়, তারা আর ওদিক মাড়ায়না। ওর ভাবনা অবশ্য ওই বাউরী বাগদীদের নিয়ে নয়, তাদের সতীশ হাজরা কোনো দিনই টাকা ধার দেয়নি। এখনো দেয়না। আছে কি ওদের! টাকা দিলে সে গঙ্গায় যাবে, উসুল হবেনা কোন দিন। গায়ে গতরে খাটিয়ে কতই আর উসুল করবে? বাসুদত্ত, করুণা লায়েক, সত্যরায় এদের নিয়েই তার ভাবনা। অনেক টাকা পড়ে আছে তাদের কাছে, ইদানীং ডাকলেও আর এদিকে মুখ ফেরায় না। আঁচ পেয়েছে গরম হাওয়ার। কেউ কেউ আবার ব্যোমকেশ মাষ্টারের দিকেও যাচ্ছে বলে শুনেছে।

শোলু রায়কে ঘন ঘন সদরে যেতে দেখা যায়। যখন ফিরে আসে তখন খবর পায় কেনারাম রাতের বেলায় কেনরামের ঘরের অন্দর মহলে আলোচনা সভা বসে। সতীশ আসে। রামকানাইও উপস্থিত থাকে।

সতীশ বলে, কেমন বুঝছ বল দেখি।

শোলু রায় বেশ গম্ভীর ভাবেই জবাব দেয়, ভাল না। সতীশের মুখ খানা শুকিয়ে যায়।

—ভাল না,—মানে কি? জিগ্যেস্ করে সতীশ।

শোলু রায় বেশ আলগা ভাবে জবাব দিয়ে, ভাল না, মানে ভালো না।

সতীশ বলে, খুন খারাপি হবে নাকি?

কেনারাম উত্তেজিত হয়ে উঠে, আরে রাখো খুন খারাপি হবে? কার কত তাগদ আমার জানা আছে! এখনো রাজত্বটা ওদের হাতে যায়নি!

রামকানাই অনেক দিন ধরেই ধান-চালের কারবার করছেন। বাপের কাছ থেকে বিশ বিঘা জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে, সেই বিশ বিঘাকে একশ বিঘায় পরিণত করেছেন কৌশলে।

এদের গরম গরম কথা বার্তা শুনে কেনারাম বলে, মাথা খারাপ করলে কাজ উদ্ধার হয় নাকি!

—মাথা খারাপ কতক্ষণ হবেনা শুনি? গাঁয়ের দেয়ালে দেয়ালে কী সব লিখেছে দেখেছ? মিটিং মিছিল—আর গালাগালি? উত্তেজিত ভাবেই বলে কেনারাম।

শোলু রায় বোঝেন কেমন করে কাজ আদায় করতে হয়। তাই একটু খানি হেসে বলে অবশ্য মাথা খারাপ হওয়া দোষের নয়। তাই বলে কাজ বাগাতে হলে– এমন কৌশল নিতে হবে, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।

সতীশ বলে, তাই ঠিক্।

—বেশ তবে তাই করুণ, বলে কেনারাম। তবে যেটাই করতে হবে, সেটা এখুনি করা দরকার।

শোলু রায় মাথাটা একটু নেড়ে সায় দেয় হাঁ তাই হবে, এবং আস্তে আস্তে বলে তার ব্যবস্থাও সে করে এসেছে—তবে বিশ পঞ্চাশটা টাকা খরচ হবে।

যেহেতু কৌশলে কাজ হাঁসিল করতে হবে, সেই হেতু টাকা খরচে পিছ—পা হলে চলবে কেন?

রাজীই হয়ে যায় সবাই। এবং সেই মাফিক একটা পরিকল্পনাও তৈরী হয়।

এর পরেই পর পর কয়েকটা ঘর থেকে চুরির সংবাদ রটে গেলো। এবং একদিন রামকানাই-এর খামারে আগুনও জ্বলে উঠলো।

কেনারাম বললো, দেখছত সবাই, এ গ্রামে কোনো দিন ঘর থেকে—মরাই চুরি করা কেউ শুনেছে? আর এই যে আমার খামারে আগুন ধরলা? কারা এসব অশান্তি সৃষ্টি করছে তা কি জানিনা আমরা?

অন্য পক্ষ থেকে জবাব এলো, এসব করছে ত কেনারাম নিজে। কেনারামের কানে কথাটা গেলো। কেনারাম বললো, হাঁ আমি আমার খামারের ধান পুড়িয়ে দিব। মাস্টারির বুদ্ধি কিনা।

এরও জবাব আছে, বললো ব্যোমকেশ। ধানে আগুন দেয়নি কেনারাম, দিয়েছে খড়ে। তাও মাত্র কয়েকটা আঁটি।

ঐ অশান্তির মধ্যে থাকা যায় না। অতএব একদিন অশোক দারোগাকে দেখা গেলো সুভাষ টাকুরের দোকানে। রামকানাই-এর ছেলে কেনারাম আর শোলু রায় আগে থেকেই ছিল সেখানে। জানতে কারো বাকী থাকলোনা না যে খবর দিয়েই অশোক দারোগাকে আনানো হয়েছে।

কেনারামকে দেখে অশোক দারোগা বললো, গিয়েছিলাম মশায় একটা ধান লুঠের তদন্ত করতে। দিলাম আট দশটাকে মিসায় চালান করে। এখন থাক জীবন ভর। আন্দোলন করবে—হা হা হা। কি হে দোকানী সিগারেট রাখো।

কেনারাম বললো, রাখে বৈকী। দে ভূষণ একটা প্যাকেট। আমি আবার ক্যাপস্টেণ্ড ছাড়া খেতে পারি না। তা আপনাদের এখানেরও কিছু কিছু সংবাদ পাচ্ছি শোলু বাবু।

কেনারাম সিগারেটের প্যাকেট্‌টা এগিয়ে দিয়ে বললো, যা শুনেছেন তা মিথ্যে নয়। শান্তিতে থাকবারই উপায় নেই। আরে রাখুন যতক্ষণ এই থানায় আছি ততক্ষণ অশান্তি হতে দিব না। আচ্ছা এই শালা কমিউনিস্ট—আমি ওদের শালাই বলি, কি নাম যেন? কেনারাম একবার তাকালো শোলু রায়ের দিকে উদ্দেশ্যটা বুঝতে বাকী থাকলো না শোলু রায়ের। শোলু রায় বললো আপনি ত জানেন স্যার। হাঁ কি যেন নামটা—মাস্টারি করে। না? আবার কি হাঙ্গামা বাধাচ্ছে? শালা কমিউনিষ্টদের আমি দেখতে পারি না, কেন জানেন? ওরা দেশের শত্রু। নেতাজীকে বলে কিনা, আরে ভারতবর্ষে কি কমিউনিজম হয়? শালারা সব বাঁকা পথ ধরেছে।

মুরুলি এতক্ষণ এক পাশে বসে এদের বাক্যালাপ শুনছিল, কিন্তু দারোগা বাবুর শেষের কথাটায় ফিক্ করে হেসে উঠলো।

দারোগা বাবুর নজরটা সেদিকে পড়তেই, তিনি বললেন, এই ব্যাটা তুই হাসলি কেন?

—হাসি লাগলো হুজুর। হাত দুটি যুক্ত করে বললো মুরুলি।

—হাসি লাগলো?

—হাঁ হুজুর।

—হাঁ হুজুর? কেন হাসলি, বল।

—বৈলব?

—হাঁ বলবি। কে এটা?

মুরুলির উপর পাছে দারোগাবাবুর রোষটা পড়ে তাই সুভাষ ঠাকুর বললো ও একটা ভিখারী। না হুজুর। ভিখ্ আমি করিনা। বললো মুরুলি।

সুভাষ ঠাকুর একবার কড়া চোখে তাকালো মুরলির দিকে। কি হ দারোগা সাহেবের মেজাজটা গরম করে দিয়ে। বোঝেননা, যদি এখন ধরেই নি যায়, তবে করবি কি!

--ভিখ্ করিসনা ত কি চুরি করিস? জিগ্যেস্ করলেন দারোগা সাহেব।

—ঐ কথাটি বাবুরাও বৈলতে লারবেক।

—তোর পেট ভরে কি করে?

—গায়েন করি, খাই। আপনার কথায় একটি গায়েন মনে পৈড়ে গেইছিল তাই হাসি বিরায় আস্যেছিল। কেনারাম বললো, গা না। হুজুরকে এক গান শুনিয়ে দে। মদের দামটা দিয়ে দিবেন হুজুর। তবে গাই—

এক তারাটা সুরের সঙ্গে বেঁধে নিলো মুরুলি—তারপর বললো, জানেন হুজু এই দুনিয়ায় সবই বাঁকা—সেই বাঁকারই গান—

যত বাঁকা নদ-নদী খাল গঙ্গা যমুনা
তাতে চলে বাঁকা তরি ভেবে দেখ না
মনরে ভেবে দেখ না
আর ঘি তুলতে আঙ্গুল বাঁকা
সোজা হলে উঠে কই?

জানেন হুজুর সোজা আঙুলে ঘি উঠে না। আঙুল বাঁকাতেই হয়। ি বল ঠাকুর?

—শালা এটা কমিউনিষ্টদের গান। এ গান গাইলে কিন্তু ধরে নিয়ে যাব ওই বাঁকা আঙুল ভেঙ্গে দিব, বুঝেছিস?

দারোগা বাবুর কথায় হেসে উঠলো শোলু রায় আর কেনারাম কিন্তু দারোগ সাহেবের ওই সতর্কীকরণে মুরুলির চিত্ত যে একটুও চঞ্চল হয়নি, তা বোব গেলো, যখন সে বললো, মদের পয়সাটা হুজুর—

এ কথার কোনো উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না দারোগা সাহেব তিনি উঠে পড়লেন।

কেনারাম বললো, বেলা ত হয়েছে—

শোলু রায় বললো, সেই ভালো।

দারোগা বাবু বললেন, পরে।

দফাদারটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ একটা চুটি টানছিল, দারোগা সাহেবকে উঠতে দেখে এগিয়ে এলো।

দারোগা সাহেব বললেন, এ গ্রামে কী সব চুরি ডাকাতি হচ্ছে, খামারে আগুন লাগাচ্ছে তুই খবর দিস্‌নি কেন? নজর রাখবি। বুঝেছিস?

(এও)

কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছে নমি। বেগুন পোড়ার মত হয়েছে দেহটা। হাড়ের খাপের উপর চামড়াটা ঢাকা আছে। এখন আর উঠতে পারে না। সারাটা দিন রাত মাটির উপর একটা বস্তা পেতে শুয়ে থাকে। এই দিন কয়েক আগে পর্য্যন্ত মানি ওকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়েছে উঠানে। মুখ ধুইয়ে দিয়েছে। দাওয়ায় বসিয়েছে। চুপি চুপি জিগ্যেস্ করেছে, ক্ষিদা লাগছে মাই!

চোখ দুটো বন্ধ করেই থাকত নমি। খাবর কথায় ক্লান্ত দুটি চোখ একটুখানি খুলে, বলত, খাবার ভাত?

—হ্যাঁ।

—নমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলত, কুথায় পাবি?

—আমি লিয়ে আইসব। যাব?

—কিন্তুক তুর মা যদি—

মানি বলত, লুকাই লুকাই আনব, কেউ জানবেক নাই।

—যা তবে।

নমিকে শুইয়ে দিয়ে গোপনে গোপনে যেত মানি। নাপিত বৌ-এর কাছে গিয়ে দুটি ভাত চাইত। একদিন দিয়েছিল নাপিত বৌ কিন্তু তারপরে আর দেয়নি।

সেদিন ঘরে আর কেউ নেই। ভূষণ, তার মা সাবি, বিহারী সবাই গেছে ব্লকে। ধান চাল গম-যা হোক কিছু তাদের চাই। এমন করে দিনের পর দিন উপোসে মরতে রাজী নয় কেউ। ওদের সঙ্গে গেছে মাস্টার। মানি যেতে পারেনি নমিকে ছেড়ে।

মানি একটা পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে নমির মুখটা মুছিয়ে দিয়ে, খানিকটা জল মুখে পুরে দেবার আগে বললো, লে কুলকুচু কর। হা কর মাই—

হা করলো নমি, জলটা পুরে দিয়ে বললো লে ফেলে দে। নমি সে জলটা আর ফেললোনা।

জল-ট খাঁয়া লিলি মাই।

এর কোনো জবাব দিলোনা নমি। শুধু একবার একটুখানি চোখ দুটো খুলে আবার বন্ধ করে দিলো।

মানি আস্তে আস্তে বললো, খাবি?

—কি—

—বলছি, খাবি?

—হুঁ।

—আন্যা দিব?

—যা—

ডোম গোঁড্যায় অনেক কচু শাক আর শালুক গেড়ী দেখে এসেছে মানি। সেই আনতেই বেরিয়ে গেলো সে। খানিক পরে ফিরে এলো। কচু শাকগুলো কারা তুলে নিয়ে গিয়েছে। দুঃখ হলো মানির। নিজের মনেই বললো, পেটে পুড়ুক—হে মা কালী যারা নিয়ে গেইছে তাদের যেমন কলেরা হোক্ তবে হ্যাঁ শালুক গেঁড়ীগুলো আছে। জলে নেমে তাই গোটা কয়েক নিয়ে এলো নমির জন্য।

নমির কাছে গিয়ে মানি ডাকলো, মাই! মাই! ও মাই!

কোনো জবাব পেলোনা নমি।

তারপর প্রথমে মাথায় তারপর দেহটাকে নাড়া দিয়ে আবার ডাকলো মা-ই!

এবারেও কোনো সাড়া না পেয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো তার। এতক্ষণ যে বস্তুগুলোকে যত্ন করে আচলের ভিতর ধরে রেখেছিল, সেইগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে আবার চীৎকার করে বললো - মাই, চায়্যা ছাখ্, গেড়ী আন্যাছি মা-ই—

দ্বিতীয়

(ক)

দিন যায়, তারই সঙ্গে অতীতের গর্ভে ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে অবস্থান করে মানুষের দুঃখ বেদনার খণ্ড খণ্ড চিহ্নগুলি। আবার সেই চিহ্নগুলি কোথাও দেখা দেয় বৃহৎ হয়ে আগামীতে, কোথাও বিস্মৃতির গভীরে যায় তলিয়ে। অন্ধকারের পরেই আলোর আবির্ভাব ঘটে জাগতিক নিয়মে আবার আসে অন্ধকার। প্রতীতী জন্মায় মানুষের মনে অন্ধকারই একমাত্র স্থির নয়—আবার পূর্বাকাশে সূর্য উঠে

আবার আলোময় হয়ে উঠে পৃথিবী। আবার স্তরন হয় দ্বন্দ্ব—সংঘাত জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। সংগ্রামী মানুষের অতীতের দিনগুলিই নিয়ে আসে নিরেট দুর্ভেদ্য ওমিস্ত্রা বিদারী মশাল।

এক ভাদ্রে নমিকে হারিয়েছে—না খেতে পেয়ে অনাহারে মরেছে নমি—এইটাই মশালের আলো হয়ে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। অন্ধকারকে হার মানাবার কঠিন সংকল্প নিয়েই আবার বুক বেঁধেছে বাউরী পাড়ার মানুষগুলি। একটা ভরসা পেয়েছে এবারে আর না-খেয়ে কেউ মরবে না।

এক নাগাড়ে কয়েকটা মাস লড়াই করে এখন বিশ্রাম করছে মানুষগুলি। লড়াই-ই বটে -- সেই বৈশাখের শেষ হতে ভাদরের এই পনেরোটা দিন পর্য্যন্ত, নিঃশ্বাস নেবারও সময় পায়নি এরা। আজ রোদের দিকে পিঠ করে কুলি রাস্তার ধারের একটুখানি ভিজে মাটির উপর বসে গত দিনের কথাগুলি নিয়েই নাড়া-চাড়া করছিল এরা। আশে-পাশে ভিজে মাটির উপর কয়েকটা বাচ্চা ব্যাং লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল খাদ্যের সন্ধানে, কয়েকটা মোরগ আর মুর্গী আস্তাকুড় সংলগ্ন একটা ডোবায় জমে-থাকা জলের মধ্য থেকে সরু সরু ঠোঁট্ দিয়ে খুপ্ খুপ্ করে তুলে নিচ্ছিল পোকা-মাকড়। আর তাই দেখে একটা ধাড়ী মোরগ তার গলার পালক ফুলিয়ে তড়ি-ঘড়ি এসে মুর্গীগুলোকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল। দৃশ্যটা দেখে হেসে উঠলো বিহারী।

কি রে। হাসলি যে? জিগ্যেস্ করলো ভূষণ।

বিহারী বললো, লালু খুড়ার মুর্গাটার মাইরী জোতদারের মেজাজ।

বিহারীর কথায় হো হো করে হেসে উঠলো সবাই।

ভূষণ বললো, উয়াদিকে সমিতি গড়তে বল বিহারী।

এ-কথায় আরো হাসির রোল পড়লো।

বিহারী চুপ।

কথার উত্তর দিলো গ্যাড়া, তা সমিতি না কৈরলে আমরা জিততেও পারতাম; কি বল বিহারী।

—তুমরাই বল। সমিতি না কৈরলে দিথ… কেনারাম সাত টাকা হাজিরি? এই-ট দি থ।

তা ঠিক রামকানাই আর কেনারাম ত বলেই দিল, যা চিরকাল দিয়ে এসেছে তাই দিবে—তার বেশী নয়। সেটা কত? না—মরদদের এক টাকা আর কামিনদের আট আনা—তার সঙ্গে এক পাই করে মুড়ি আর পাঁচটা করে বিড়ি।

এ-দিলে চলবে কেন ? পেটের তরে ত খাটালি, তা পেটই যদি না ভরে—তাই সমিতিও জানিয়ে দিয়েছিল, আট টাকা দশ পয়সা না দিলে ক্ষেতে কেউ নামবে না। সরকারও ওই দর বেঁধে দিয়েছে যখন, তখন সেটা মানতে হবে। গ্যাঁট হয়ে বসেছিল মানুষগুলি। ঘরে ঘরে যাওয়া-আসার কমতি ছিলনা। জলে থৈ থৈ করছিল মাঠ—লাঙল পড়েনি, ক্ষেত কামাল হয়নি। বছর পেরিয়ে গেলে কি আর চাষ হবে !

না হয়, না হবে, তাই বলে নিজের পায়েই নিজে কুড়ার মারবে ? তা হয়না !

রামকানাই ঝানু লোক। ব্যাটার অসতেই একদিন বিহারীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

গিয়েছিল বিহারী। সে-কী আদর !

বলেন কি বলবেন। বলেছিল বিহারী।

রামকানাই বসেছিল তার বাইরের ঘরে। খত্যোর মত গোঁপ জোড়াটা ডান হাতের কয়েকটা আঙুল দিয়ে বসিয়ে নিয়ে বলেছিল, বস্, বাবা বস্।

বিহারীর মেজাজটা ভালো ছিল না। সে বলেছিল, বসবার সময় নাই। বলেন কি বলবেন !

পাশেই একটা চৌকীতে বসেছিল কেনারাম। পিট্ পিট্ করে চাইছিল বিহারীর দিকে। বিহারীর কথায় চটে উঠে বলছিল, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস্ যে।

—আমরা আর ঘোড়া কুথায় পাবো। না-ই আমাদের ঘোড়া বলুন ঘোড়া। গাড়ী বলুন গাড়ী।

রামকানাই ঝানু লোক। বিহারীর কথায় একটুখানিও মেজজে খারাপ না-করে হেসে উঠেছিল।

—ঠিক বলেছিস্—বেশ বলেছিস্। তোর বাপও ছিল ওমনি। ঘোড়ার মতই ছুটত। এখুনি এইখানে ত পরক্ষণেই পাঁচ মাইল দূরে। শুন তবে—ঘোড়ার কথা যখন এলো তখন বলি—এই কেনারাম এখন ছোট, তখন ওর টাইফয়েড হলো। ডাক্তার বললো মাথায় বরফ দিতে হবে। করি কি—এ-গ্রামে ত বরফ পাওয়া যায় না। বরফ আনতে যেতে হবে নদী পেরিয়ে আসানসোল। এগারো বারো মাইল রাস্তা দশটার মধ্যে বরফ চাই। তখন রাত্রি দশটা। কে যাবে—আমি লোক খুজছি, তা তোর বাবা বললো। ভাবছেন

ক্যানে বাবু, ঠিক বেলা ন'টায় বরফ আসবেক। জিগ্যেস্ করলাম, কে আনবে? তা জবাব দিলো, আমি ত আছি। নুন খাই···আর এইটুকু কৈরে দিব নাই। তাই করলো। ঠিক ন'টায় বরফ এনে হাজির। তাই বলছিলাম—

কেনারাম অধৈর্য্য হয়ে উঠছিল ক্রমশই। এ সব অবান্তর প্রসঙ্গের প্রয়োজন কি? তাই বাবাকে বলেছিল, কি জন্যে ওকে ডেকে পাঠিয়েছ বল না!

—বলবো। বলব বৈ কী। ওকি আমাদের পর নাকি? তা তুই দাঁড়িয়েই থাকলি ব্যবা? বস—ওই আসনটাতেই বস্। লজ্জা কি?

—বসার সময় নাই বাবু। বলেছিল বিহারী।

একটা ছোট লোককে এই ধরণের আপ্যায়ণ সইতে পারছিল না কেনারাম। পায়ের তলায় যে বস্তুর স্থান তাকে মাথায় রাখা যায় না। মাথার উপর সেটা দাপাদাপি করলে আরো সেটা অসোয়াস্তির কারণই হয়। তাই কেনারাম বলেছিল, একেবারে লাট সাহেব হয়ে গেছিস যে।

--তা ক্যানে হৈতে যাব।

রামকানাই সাথে সাথেই বলেছিল, ঠিক্ বলেছিস। আমাদের বিহারী, বিহারীই আছে। সম্পর্কটা ত আর আজকের নয় ওর বাপও ত ছিল। তা শোন বাবা, সম্পর্কটা খারাপ করিস না।

বিহারীর জবাবটা ওর ঠোঁটেই। সে সাথে সাথেই বলেছিল, আমরা আর সম্পক্কে খারাপ করছি কই।

--বেশ, না হয় দেড় টাকাই নিস্ যাঃ আর দর কষাকষি করিস না। সবাইকে বল গিয়ে কাজ করুক।

বিহারী বলেছিল সমিতির রায়, অমান্য কে কৈরতে পারে।

সমিতি, সমিতি—সমিতি মানে ওই ব্যোমকেশ মাষ্টার।

কেনারামের সমস্ত শরীরটা রি রি করে উঠেছিল! যাদের এতকাল হুকুম করে কাজ করিয়েছে, তাদের আবার এই খোসামুদি কেন? ওরা ওই একটা জিনিসকেই বোঝে।

—সমিতির রায়ে পেট ভরবে?

এর কোনো জবাব দেয়নি বিহারী, উত্তর দিতে মন চায়নি।

কেনারাম বলেছিল, ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব হয়?

---তবে তাই ছড়ান বাবু। দেখুন কত কাক আসে।

আর দাঁড়ায়নি বিহারী, কথাটা বলেই চলে এসেছিল।

শেষে ভাত ছড়াতে গিয়ে যখন কাকের দেখা মিলোনি তখন সাত টাকা দিতেই রাজী হয়ে গিয়েছিল রামকানাই।

(খ)

কাল সারারাত থেকে থেকে জল পড়েছে। জল হলেই কষ্ট। সারা রাতটাই জাগরণে কাটে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টেনে টেনে বিছানা ছেলে-মেয়েদের টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া। সে এক যন্ত্রণা। তখন মনে হয়, পেটে না থাক অন্তত মাথার উপর একটা ছাদন দরকার। নইলে কাঁথা-কাঁথুড়ি চট চ্যাটাই যাই থাক তাই মাথায় দিয়ে রাত কাটানো যায় না। আরো দুর্গতি বাড়ে।

সকাল বেলায় ঘরের মধ্যিখানের জমে-থাকা জলটা পরিষ্কার করে আবার জল আনতে হাঁড়ী নিয়ে পুকুরে যাবার জন্য যাওয়া। তারপর পুকুর থেকে আবার ফিরে এসে উঠান পরিষ্কার। তারপর আছে রান্না খাওয়া, দুটো চারটা তালপাতা কুড়িয়ে আনা। এত কাজ কি একা করা যায়। বিরক্তি ধরে যায় ভাসির!

—বলি ও সাধের বিটি মানি! কলসীটা কাখালে নিতে নিতে হাঁক দিলো ভাসি।

কোনো সাড়া মিললো না।

আবার ডাকলো, মানি, ও মানি!

বিহারীর ঘরের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সাবি মাথাটা বের করে বললো, কি বৈলছ খুড়শাস্?

—বলি মাণি আছে তুর ঘরে?

—ছিল।

—ছিল ত গেল কুথায়?

সাবি একটু হাসলো।

—শুনলে ত তুমি রাগ্ করবে। বললো সাবি।

—রাগের কথা হলেই রাগ কৈরব। বলি গেইছে কুথা?

—বল রাগ করবে নাই?

—বল দেখি।

—গেইছে কাঁচ পোকা ধরতে।

এতে রাগ হবারই কথা। বর্ষণ হালই ওই ছুড়ির বনে কাঁচ পোকা আসে। মেয়েরা তার টিপ্ করে। এক একটা ডানায় দু তিনটে টিপ্ হয়। তাই বনে গেছে মানি। ভামি ফিক্ করে হেসে বললো, এই কি কাঁচ পোকা ধরার সময় ? তুই-ই বল্ বৌ। দেখ্ ঘরের এত কাজ পৈড়ে রইছে।

সাবি হেসে উঠলো। জোরে নয়। একটুখানি চমক লাগার মত। হাসির রূপটা দেখে মনে হয় সাবি যেন এমন একটা বিষয় অবগত আছে, যা প্রকাশ করতে চায় না।

ভামি বললো। তুই হাসছিস বৌ ?

—হ্যাঁ খুড়শাস্ উয়ারও ত সাধ-সখ আছে। বললো সাবি।

এই সাধ-সখের কথা মনে হতেই সাবির মনে পড়লো তার কৈশোরের দিনগুলি। কিশোরীর চিহ্নগুলো দেহে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই সবাই বলতেন, রূপ হেঁয়্যাছে লখনার বিটির। সেই বয়সে যা দেখত তাই ভালো লাগত সাবির। দেহটাকে নানাভাবে সাজাতে ইচ্ছা হতো। ইচ্ছা হতো-- বাবুদের মেয়েদের মত সেজে থাকতে। কিন্তু তা হতে পারেনি। সে সব দিনগুলি মনে আছে। তারপর যেদিন যৌবন এসে ডাক দিয়েছিল, সেদিন চেয়েছিল ও এই পৃথিবীটাকে ভালবাসতে। যা দেখেছে তাই ওর চোখে রঙীন হয়ে ধরা পড়েছে। দৃষ্টিতে ছিল চাঞ্চল্য, দেহের প্রতি অণুতে ছিল একটা উত্তেজনা। এমনি সময়েই চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল বিহারী। সেও আবার ছিল অকস্মাৎ। কিম্বা হয়ত দুই ভিন্ন গ্রামের দুজনকে টেনে নিয়ে এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল ওদের পেটের ক্ষুধা ! সেটাও ছিল এমনি বর্ষা।

পাশাপাশি দুটো ক্ষেতে কাজ করছিল দুজনে। বিহারী কামাল করছিল একটা ক্ষেত। আর সাবি আরেকটা কামাল করা ক্ষেতে চারা পুতছিল নুয়ে নুয়ে।

ছেলেটি গেয়ে উঠেছিল.—

কাদের ঘরের বিটি গো
নুয়ে নুয়ে নাফর পুতে গো—

সাবিই বা কম যায় কিসে। সেও গেয়ে উঠেছিল,—

কাদের ঘরের ব্যাটা হে
পরের ক্ষেতে কামাল করে হে।

এরপর গানে গানে মনের কথা বলার পর্ব শেষ হলেই একদিন মনটাই দিয়ে বসেছিল।

আজ তারও সখ হয়েছে টিপ পরবে, তাই প্রস্তাবটা সেই দিয়েছিল মানিকে। মানি টিপ্ কাটতে জানে না। মানিকে বলেছিল সে কেটে দিবে।

ভামি সাবির কথায় একটু হেসে বললো, তা না হয় উ বেলায় যাস। কাঁচ পোকা পালাই যাছে নাই।

সাবি বললো, কাজ-ট আমিই করে দিব খুড়শাস্। তুমি যাও।

ভামি হাঁড়ীটা নিয়ে বেরিয়েই আঁখড়া গাছের তলে পাড়ার মানুষদের দেখে বললো, বলি ভাদর পড়তেই মাটি ভাপাতে বসেছ সব!

গ্যাড়া এখন সবে মাত্র একটা বিড়ি ধরিয়েছে। টানটা টেনেই বললো, মাটি ভাপাছি নাই গো—

ভামির মুখ বড়ো দড। ওর মুখে কিছু আটকায় না!

গ্যাড়ার কথা শুনে বললো, তবে কি হৈছে শুনি!

গ্যাঁড়া আরো ফাজিল। বেশ গম্ভীর ভাবে বিড়িটায় কয়েকটা টান মেরে বললো, দরদ মারছি।

ওর বলার ধরণটি দেখে হেসে উঠলো বিহারী ভূষণ নোকুল। ভামিও না হেসে থাকতে পারলো না।

—বলি, দরদ কিসের? কবে চাষ উঠেছে, এখনো তার দরদ? বাউরী ঘরের মরদ ত। জানে মিয়াকে মারতে আর উপাস দিতে।

বিহারী এবার বললো, না খুড়ো গতর তাতাছি।

গ্যাড়া বললো, ভাদরী রোদ খুড়ী—পঁকা মরবেক।

—পঁকা তবে ধরেছে বল্! বলি গেল ভাদরে ত শাশুড়ী গেলো। আবার ভাদর ফিরে আসেছে।

এতক্ষণ কুলি রাস্তার এক পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া জলটাকে বাঁধিয়ে একটা বাঁধ করে খেলা করছিল ভূষণের পাঁচ ছয় বছরের ছেলেটা। অনেকখানা জল জমা হয়েছে। এবার বালির বাঁধটা ভেঙে যাবার উপক্রম হতেই এটেল মাটি দিয়ে শক্ত করে গড়বার জন্য মাথাটা ফেরাতেই, ভামি বললো, মরবি যে! উঠে আয় বলছি।

ছেলেটা উঠে এলো। মায়ের আঁচল ধরে বায়না ধরলো, সে মায়ের সঙ্গে পুকুরে গিয়ে শালুক ফুল নিয়ে আসবে। গেঁড়ী আনবে, আর গুগলি।

ভামি ছেলেটার কথার জবাবটা পুরুষদের শুনিয়ে দিল।

—আর ত দুটা দিন পরে তাই খাবি।

বিহারী বললো, না খুড়ী আর গেঁড়ী খাঁয়্যা থাকতে হবেক নাই।

ভামি তার ডান হাতের পাঁচটা আঙুল বিহারীর মুখের সামনে মেলে আঙুল নাচাতে নাচাতে বললো, হুঁ ঘরে যে মরাই বাঁধা আছে। কথা শুনলে গা-জ্বলে।

কথাটা বলেই চলে গেলো ভামি।

ও চলে গেলেও রেখে দিয়ে গেলো একটা ভাবনা। সেই পুরোণো ভাবনা—কি করে পেট ভরবে?

ভূষণ একবার তাকালো বিহারীর দিকে। এখন আর চাষ নেই যে দর কষা-কষি করবে। এখন তাদের ডাকবেই না কেউ। আবার সেই অগ্রহায়ণ-পৌষ। কিন্তু এই ক'টা মাস?

বিহারী বললো, ব্যবস্থা হবেক খুড়া!

(গ)

'ব্যবস্থা হবে' কথাটা না খেতে পেয়ে যারা এই কয়েকটা মাস মরে কিম্বা মরতে মরতে বাঁচে—তাদের একটা ব্যবস্থা হবে। কথাটা কেমন রাষ্ট্র হয়ে গেছে সর্বত্র। এ রটনার কারণও আছে, নূতন সরকার হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্রেও সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। কংগ্রেস নেই। এসেছে জনতা সরকার—অতএব একটা নূতন কিছু করতে চায়। শোনা যায় বামফ্রন্ট সরকার নাকি বলেছে—উপোসে কাউকে মরতে দেওয়া হবে না।

কথাটা নিয়ে ইতিমধ্যেও খণ্ড বিক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সবারই কাছেই এটা অসম্ভব মনে হয়েছে। সব সরকারই গদীতে বসে অমনি একটা করে বুকনি ঝাড়ে। অতএব এ বিষয়টা নিয়ে আর যেই মাথা ঘামাক, কেনারাম, সতীশ, শোলুরায় মাথা ঘামায় না, বরং নিজেদের মধ্যে হাসা-হাসি করে। এদের থেকে বৈষয়িক বিষয়ে বিচক্ষণতার অধিকারী রামকানাই। সে হাসে না। বামফ্রন্ট সরকারকে বিশ্বাস নেই। অসম্ভলও হয়ত সম্ভব হতে পারে। একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন, এটা হাসা-হাসির কথা নয়। শোলুর আর কয় বিঘে জমি আছে নিজের? ওর বাবাতো ছিলেন এক উকীলের মুহুরী। পাঁচ সাত বিঘা জমি—ঘরে যে ধানটা আসে, তার চৌদ্দ আনাই সরকারি জমির আর সতীশ হাজরার ত নগদের ব্যবসা!

কেনারাম বললো, তাহলে আমাদেরই বা ভাবনা কি?

—ভাবনা ত আমাদেরই, এখনো ঘরে আট-টা মরাই রয়েছে।

—তুমি কি ভাবছ লুঠ-পাঠ করবে?

—লুঠ করবে কেন?

—তবে?

—আইন! আইনেই নিবে।

—এমন আইন আছে নাকি, ঘরের ধান-চাল নিয়ে যাবার আইন আছে?

—করতে কতক্ষণ। তাই বলছি শুন্, হাত কর বিহারীকে। কেনারাম বাপের যুক্তিটা মেনে নিতে পারলো না, বিশেষ করে অন্য কারো উল্লেখ করলেও হয়ত কেনারাম ভেবে দেখতে পারত, কিন্তু ঐ বিহারী কি ব্যোমকেশ এদের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে না তার।

রামকানাইকে বললো কেনারাম আগে ত সে দিনটা আসুক তখন ভে[বে] দেখা যাবে।

—কেনারাম ভেবে দেখেছে।

একদিন নয়, পরপর কয়েটা রাত্রিই ভালো করে ঘুমুতে পারে নি কেনারাম অনেক কিছু মাথায় এসেছে। এ বছরটাতেই শনির দৃষ্টি পড়েছে তাদের উপর ওই সাত টাকা হাজরি নিয়েই কি কম হুজ্জোৎ পোয়াতে হয়েছিল। এখান ওখা[ন] থেকে মজুর আনিয়েছিল কেনারাম, কিন্তু তাদের আর মাঠে নামতে হয় [নি] তারা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছিল, জীউ-ট দিতে লারব গো। ভরসা দিয়ে[ছিল] কেনারাম। শোলু রায়ও গোপনে গোপনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছি[ল] ভাবনা নাই পুলিশ দারোগা থাকবে।

ওরাও জবাব দিয়েছিল, আগে পুলিশ দারোগা আসুক। পুলিশরাও কে[মন] ত্যাদড় হয়ে গেছে। যে দারোগা ব্যাটার পেটে এখনো কেনারামের ঘ[রের] বাসমতী চাল আর মাছ গজ্ গজ্ করছে। সে বলেছিল কিনা—হুকুম কেনারাম বাবু।

—তাহলে আমাদের জমি চাষ হবে না? অশোকবাবু ত সাহায্য করতে দারোগা নতুন এসেছে। তার উপর বয়সটাও কম। দারোগাবাবু বলেছি[ল] তখন রাজা ছিল আলাদা, আইনও ছিল ভিন্ন।

—নূতন সরকার হলে কি দেশের আইনও পাল্টে যাবে?

—এসব বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করবার মত সময় নেই। এ আমাদের করার কিছু নেই।

—কিন্তু আইন-শৃংখলা ?

—তা নিশ্চয়ই আমরা দেখবো। বিশেষ যদি কারো বিষয়ে আপনার অভিযোগ থাকে তা ডাইরি করে যেতে পারেন।

বিফল হয়েই সেদিন ফিরে এসেছিল কেনারাম।

আবার আলোচনাও করেছিল শোলু রায়ের সঙ্গে। যেটা শোলু রায় বলেছেন সেটা ভেবে দেখার মত। নিজেদের স্বার্থ নিজেদেরই রাখতে হবে! কেউ তা রেখে দিবে না।

অতএব সেই ব্যবস্থার উদ্যোগ করেছিল কেনারাম। আবিষ্কার করেছিল—টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত না হলে কাজ হাসিল হবে। এখানেই রামকানাই-এর আপত্তি। সে বুঝেছিল—গুণ্ডা আমদানি করে এক আধ বিঘায় ধান পোতা যায় কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন জমিতে ধান পুঁততে হলে গুণ্ডা দিয়ে হবে না, তাতে অবস্থা আরো খারাপ হবে, তাই বিহারীদের সঙ্গে একটা মিটমাট ফয়সালা করে নিতেই বলেছিল সে।

তাই হয়েছিল। অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। এই পরাজয়টাই মাঝে মাঝেই কেনারামের অন্তর দগ্ধ করত চাষের ক'টা মাস। অনেক-ক'টা টাকা বেরিয়ে গেছে তারও একটা বেদনা কেনারামকে পীড়া দেয়।

শোলু রায় বলেছিল, ভাববে না ভাইপো। চাষের পর আবার সেই তোমার দুয়ারেই আসতে হবে দেখে নিও। সেইটাই ছিল ভরসা।

কিন্তু যে-সব সংবাদ কানে আসছে তাতে ভরসার থেকে ভয়ই হয় ওর। যদি লুঠপাঠ করে, যদি ডাকাতি করে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে একটা দুর্বলতাও দেখা দেয় ওর মনে। কিন্তু কাকেউ বলে না সে কথা!

ব্যোমকেশ মাষ্টার জোর দিয়েই বলে বেড়ায়—প্রতি বছর যে গরীব মানুষগুলি একেবারে নিরেট উপোসে মারা যেত, এবার আর তা হবে না, হতে পারে না।

সন্ধ্যাবেলায় ভূষণের উঠানে আসে পাড়ার পুরুষ মানুষরা। দিনে দিনে সংখ্যা বাড়ে। ইতিমধ্যে বিহারীর আর ভূষণের ঘরের মধ্যিখানের মাটির দেয়ালটা পড়েই গিয়েছে। ভালোই হয়েছে। উঠানটা বেশ প্রশস্ত হয়েছে। এখন আর আকাশে মেঘ নেই। শরতের লাল আকাশে দু চারটা তারা দেখা যায়। মাঝে মাঝে চন্দ্রের আলোও। চাঁদের আলোয় মজলিশটা জমে ভালো। পুরুষরা

বসে উঠানে, মেয়েরা হয় উঠানেরই এক পাশে একটুখানি চালায় রান্না করে, নয় পুরুষদের স্পর্শ বাঁচিয়ে একটু দূরে বসে এদের কথা শুনে।

আলোচনা হয় আগামী দিনগুলি নিয়েই। ব্যোমকেশ মাষ্টার যা বলেছে তাও বলে বিহারী।

মাষ্টার বললেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না; আবার অবিশ্বাস যে করবে তারও শক্তি নেই। একটা দোলায়মান অবস্থা।

বিহারী বললো, মাষ্টার বাজে কথার লোক নয়; জান!

ভামি রান্নার কাজটা মানির হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সাবি এসে বসেছে মানির কাছে। দুটো পেটের রান্না সে এই উনোনেই করে নিবে। কান দুটো আছে অন্যখানে। পুরুষরা কি বলে—তারই জন্য কান দুটো তৈরী রেখেছে।

বিহারীর কথায় পুরুষরা কেউ প্রতিবাদ করলো না, কিন্তু ভামি বললো, ম্যাষ্টর কি দেবতা রে!

—দ্যাবতা হৈত্যে যাবেক ক্যানে খুড়ি।

—দ্যাবতা ছাড়া কি অদেষ্ট পাল্টাতে পারে কেউ! বললো ভামি।

নোকলা বললো, ঠিক বল্যাছে খুড়ি। দ্যাবতাই এ গরীব লোক বড় লোব করে।

ভূষণ একবার নোকলার দিকে তাকায় আর একবার বিহারীর দিকে।

সাবি তাকিয়ে থাকে বিহারীর মুখের পানে।

বিহারী বললো, তুর মুণ্ডু করে। শালা জানিস্ না, আর বাক্যি ঝাড়ছিস্।

—দ্যাবতা করে না ত কে করে শুনি? বললো নোকলা।

বিহারী বললো, মানুষ করে।

সাবি মুখে আচলের অংশটা রেখে হাসলো।

—মানুষ করে? ভগমান করেনা?

বিহারী এ কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে। আচ্ছা বল্ রামকানাই কি কৈর‍্যা বড় লোক হৈল আর এই সতীশ হাজরা? বল! কি রে, চুপ কৈর‍্যা থাকলি যে? শালা যারা বড় লোক হয়—তারা পরের ধন লুঠ করেই বড় হয়।

নোকলা চুপ করে থাকে। এটা সত্যিই—সতীশ হাজরাকে ত চোখের সামনে ধনী হতে দেখেছে। বাউরী ঘরের বাসন-পত্র, কত ভদ্র মানুষের জমি ওর কাছে বাঁধা। সতীশ হাজরার কাগজে টিপ্ দিয়েছ কি বাস্তুভিটাটুকুও থাকবে, এই হলো প্রবাদ।

ভূষণ বললো, তাহলে যা বলছিস্ বিহারী, তা হতেও পারে। কি বল্।

—হতেই পারে লয়, হবেক-ই। সাত টাকা হাজরি কখনো পায়্যাছিল বাউরীরা ? তবে ?

বিহারীর কাছে খবর নিয়ে যায় ভিন্ গাঁয়ের মানুষরাও। সরকার নাকি সবাইকে খাদ্য দিবে। দিলে কত দিন দিবে, বিহারী সব জানে না, তবে মাষ্টার যতটুকু বলেছে তাই বলে। বলে—সরকারে যাদের বসিয়েছে এবার তারা তাদেরই লোক, অতএব নিজের লোকদের স্বার্থ-ই তারা দেখবে। তবে এ বিষয়ে 'মিটিন্' হবে। সেই 'মিটিনে' সবাই জানতে পারবে।

—মিটিন কখন হবেক রে।

– গাঁয়ে গাঁয়ে খবর যাবেক। আসিস্ তখন।

(ঘ)

একটু রাত হলে সেদিন বিঁদি এলো। আগের সেই চিকন-চাকন নেই। বয়সের ছাপ পড়েছে ওর দেহে। মুখখানা কেমন ভেঙে গেছে—তার কতটা বয়সের জন্য আর কতটা অন্য কারণে। নিটোল স্বাস্থ্য ছিল বিঁদির। শরীরের বাঁধন ছিল আকর্ষণীয়। বিঁদিকে কেউ কখনো ময়লা শাড়ী পরতে দেখেনি। মিলের রঙীন শাড়ী পরত, কখনো কখনো এক্সা-পাড় সাদা শাড়ী। তার সঙ্গে আঁট-সাঁট করে গায়ে থাকত ব্লাউজ। কত রকমের মাথা বাঁধত বিঁদি নানা রকম। কোনো দিন পাতা কাটতো—কানগুলো থাকত চুলে ঢাকা, কোনো দিন আবার খোঁপাটা আলগাভাবে রাখত ঘাড়ে ফেলে। সবাই যখন স্নান করে যেত, তখন ও যেত পুকুর ঘাটে। সাবন না-মেখে চান করতে পারত না সে।

একবার একটা গণ্ডগোল হয়েছিল—সেটা প্রথমবার। ভাদাসপুরের কামিনী ধাই-এর কাছ থেকে একটা কি শিকড় এনে খেয়েছিল, তাতেই জীবন সংসার হয়েছিল ওর। রাতের বেলায় বাঁযু কোমপাউণ্ডারকে খবর দিয়ে পয়সা খরচ করে আনিয়েছিল কেনারাম—তবে গিয়ে বেঁচেছিল।

সেবারই 'বাইময়ী' বসেছিল বাউরীদের। কিন্তু সে বাইময়ীর আইন মানেনি বিঁদি। তারপর আরো দুবার নাকি রাতে বাঁকু কোমপাউণ্ডার এসেছিল বিঁদির ঘরে।

এসব কথা এখন গাঁয়ের সবাই জানে। কিন্তু জানলেও কেউ কিছু বলে না।

—কেমন আছিস্ ভাজ্ বৌ !

বি দি ভাসিকে প্রশ্ন করলো।

সাবিও দেখেছে ওকে। ওকে দেখলেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠে সাবির। অতীতের দিনগুলো মনে পড়ে।

কাকেউ বলতে পারেনি সাবি সে-কথা। অভাব, অভাব হাঁ করে সাবিকে গ্রাস করেছিল। পরপর সাতটা দিন না খেয়ে ছিল সে। গতর আছে, কাজ ও করতে পারে। কারো বাড়ীতে কামিনের কাজ, ঝি-এর কাজ—তাও নেই। সাক্-পাতা সেদ্ধ করে যেমন নিজে খেতে পারত না, তেমনি আবার স্বামীকেও এক বাটি সাক্ সেদ্ধ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে চোখ দুটো জলে ভরে আসত। পেট ভরাবার উপায়ও ছিল—সে উপায়কে পায়ে করে ঠেলে দিয়েছিল। আবার মাঝে মাঝে সেই উপায়টাই হাত ছানি দিত। আবার ভয়ও লাগত - বুকটা কাঁপত। এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন রাতে নিজেই গিয়েছিল সাবি।

বিঁদি বলেছিল, আয়, ভিতরে বৈস্।

গোটা শরীরটা কাঁপছিল সাবির। ঘামছিল ও।

—তুমার কাছে আস্যাছিলম—আস্তে আস্তে বলেছিল সাবি।

—ভালোই ত কৈরেছিস্। ভিতরে যা দ্যাখ্ বিছানা পাড়া আছে।

—আমাকে দুটা টাকা ধার দাও। দিবে ?

—ধার ক্যানে লো। টাকা ত তুর পিছনে ঘুরে বেড়াছে। ইচ্ছা কৈরলে রাণীর হালে থাকবি। দাঁড়া আসছি।

কথাটা বুকে আঘাত করেছিল। যেন হাতুড়ির আঘাত। দুপ্ দুপ্ করছিল বুকটা। নিজের কানে নিজেই শুনতে পাচ্ছিল সে। মনে হয়েছিল এই বুঝি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে, মাটিতে পড়ে যাবে। না, এখানে থাকলে মরে যাবে সাবি। উপোসেই বরং মরবে—না, কিছুতেই সে পারবে না ওই বিছানায় যেতে !

সাবি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে বেরিয়ে এসে ছুটেছিল ঘরের দিকে।

সেই বিঁদি আবার এসেছে। কে জানে কি মতলবে এসেছে! আবার একটা আশংকাও জীবন্ত হয়ে উঠলো। যদিও কোনো ছলে সেদিনের সাবির জীবনের দুর্বলতার উল্লেখ করে! সাবি ধীর পায়ে গিয়ে ঢুকলো ঘরের মধ্যে।

—কি ভাজ-বৌ কেমন আছিস্ ?

ভাসি তখন সবে খানিকগুলো শুকনো কাঠ নিয়ে ভাংছে। এখুনি আসবে

সব,—রাতের খাবার করা আছে, এখন সারা দিনে-রাতে একবারই রাঁধে ভামি এই সন্ধ্যায়। তারই খানিকটা রেখে দেয় সকালের জন্য। জল দিয়ে পান্তা খেয়ে বেরোয় সব। পেট ভরে না তবু ও নীরেট উপোসের থেকে ভালো।

বিঁদির প্রশ্নের জবাবে ভামি বললো, তুমার মতন কি আছি ?

আমার আর থাকা কি বৌ, মরণ হয় না তাই বাঁচ্যা থাকা ! ভামির মুখটা বড়ো খারাপ। কোনো কথা বলতে বাধে না তার। সে বললো, অমন কথা কি বলে, তুমার আবার তুখ্ কিসের। পায়ের উপর পা দিয়ে ত বেশ সেবা লাও। তাও আবার যার তার লয়।

সাবি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো. সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বিঁদির মুখটা। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো বিঁদির মুখে কেমন একটা বেদনার ছাপ।

বিঁদি বললো, সেবা আর কে করবেক ? তুদের মতন কি ব্যাটা বিটি আছে।

—ব্যাটা-বিটি কি সেবা করে ঠাকুর ঝি, সেবা লেয়। তুমার কি সেবা করার লোকের অভাব ?

—অভাব না থাকলে আর আইসব ক্যানে ভাজ বৌ, অভাব আছে বলেই ত আসেছি বিহারীর কাছে।

—ই যে লোতুন শুনালে গো। ও সাবি শুন্, শুনে যা ! লোকে হাশবেক ঠাকুরঝি। যার ঘরে কিনা হাতী বাঁধা, সে আসে বিহারীর কাছে।

কাঠগুলো টুকরো টুকরো করা হয়ে গেছে। এবার ওগুলো উনোনের কাছে নিয়ে গিয়ে আগুন জ্বালাবে। ভামির কোলের ছেলেটা মায়ের আচল ধরে ভামির সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরচে। বেশ বোঝা যায়—ক্ষিদে পেয়েছে ওর। ভামি ওকে মাবে না, ধমকায়না পর্য্যন্ত।

উনোনে কাঠগুলো দিয়ে আগুন জ্বালালো ভামি। সাবি এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল, এবার নিজেই ভামির কাছে বললো।

—সত্যি বলছি ভাজ-বৌ বিহারীর কাছে আস্যাছিলম, বললো বিঁদি।

সাবির বুকটা আবার দপ্-দপ্ করে উঠলো। সে দিনের সে কথা এক বিঁদি ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু কি যন্ত্রণা—সেদিন বিহারীর সামনেও দাঁড়াতে পারেনি সাবি। বিহারী ওকে শুয়ে থাকতে দেখে অনেক প্রশ্ন করেছে। কেন শুয়ে আছে, কি হয়েছে ইত্যাদি। ও শুধু বলেছিল, তেমন কিছু হয়নি মাথাটা ঘুরছে, বিশ্বাস করেছিল বিহারী।

যা বলে সাবি তাই ও বিশ্বাস করে।

বিঁদির এখন আর লাজ-লজ্জা অপমান কিছু নেই ! অভাব অভাবই ত তাকে ওই পথে নিয়ে গিয়েছিল !

সেই কোন ছোট-বেলায় বিয়ে হয়েছিল বিঁদির তা তার মনেও পড়ে না। বিয়ের পর শ্বশুর ঘরে না থেকে কেন তার বিধবা মা-টার কাছে ছিল, তাও জান তো না বিঁদি। ওদের সমাজে 'সাঁঙা' আছে—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ। যে কোনো কারণে একে অন্যকে ছেড়ে দিতে পারে এবং আবার তারা বিয়েও করতে পারে। বিঁদি কিন্তু তা ও করেনি। ও চলে গেলে ওর বিধবা মা-টা দেখবে কে। বিঁদিকে দেখবার কিন্তু মানুষের অভাব হয়নি। রাস্তায় বেরুলেই ভদ্র মানুষের চোখগুলো কট্‌কট্‌ করে তাকিয়ে থাকত। তখন বিঁদির দেহে ভরা যৌবন; আর ছিল অভাবে ভরা সংসার। দুটো পেটের খোরাকও জোগাড় করতে পারত না। উপোস আর উপোস। এই উপোস দিয়েই বিঁদির সামনেই ওর মা ছট্‌ফট্‌ করে মরে গিয়েছিল। চোখের সামনে মায়ের যন্ত্রণা কাতর মুখটা মনে পড়তেই আঁৎকে উঠত বিঁদি। একদিন কি তাকেও অমনি ভাবে মরণের কোলে ঢলে পড়তে হবে ! এ বড়ো কু-চিন্তা, সে আর পারেনি নিজেকে আটকে রাখতে—বাঁচতে চাওয়ার জন্যই ত দেহটাকে দিয়েছিল সে !

কথা বলতে বলতে চোখে জল এলো ওর।

ভামি বললো, ক্যানে শুনি ?

—শুনলম নাকি সবাইকে খাবার দিবেক।

—কিন্তু ঘরে ত কেউ নাই ! সব গেইছে গো। মিটিন্ মিটিন্।

—সত্যি বৌ খাবার দিবেক ?

—শুনেছি ত কাজের বদলে খাবার দিবেক সরকার। তা তুমি কি কাজ করতে পারবে ? কখনো ত কর নাই।

বিঁদির অন্তর বিদ্ধ করলো ভামি শেষে। সে ধীরে ধীরে বললো, কি বৈলব বল্। কাকে আর দোষ দিব, দোষ আমারই। আসি ভাজ বৌ। বিহারীকে বলিস, যদি একটা কাজ দেয় !

(৬)

মানুষগুলির আর দেরী সয়না। বাস আসার সময়টা সুভাষের দোকান দরজায় প্রত্যহই ভীড জমে। বাস চলে গেলে আবার ভীড়ও পাৎলা হয়ে যায়। এখন

কয়েকটা দিন মুরুলি কোথায় গিয়েছে। তবে সুভাষকে একা থাকতে হয় না। কেউ না কেউ থাকেই। ইদানীং সুভাষের দোকান দরজা ছাপিয়ে ভীড় জমে রাস্তার উপর, এমন কি কোনো কোনো দিন রাস্তার ওপাশে বাগানটাতেও মানুষেরা এসে জমা হয়। ব্যোমকেশ মাষ্টার খোদ কলকাতার অফিস থেকেই সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে গেছে--কখন ফিরবে—তার ত ঠিক নেই। তাই আসে সব। খবরটা পেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে তারা। ওদের দেখা দেখি ভদ্র লোকরাও আসে। আসে কেনারাম সতীশ হাজরা আর শোলু রায়। যদি সত্যই চালু হয়--কাজের বিনিময়ে খাদ্য দেওয়ার নিয়ম, তবে তা থেকে যতটা রস টানা যায়।

শোলু রায়ের মনে ক্ষোভ--এখনো সে এই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, অথচ সে কোনো কিছুই জানে না। এ কি কাণ্ড। আজ পনেরোটা বছর তার হাত দিয়েই বিলি হয়েছে জি, আর টি, আর, খয়রাতি সাহায্য। বি, ডি, ও ই বল আর জেলা শাসকই বল রায়বাবুকে জিগেস্ না করে কেউ এক পা-ও চলেনি। আজো যখন সে-ই প্রেসিডেন্ট তখন সব কাজটাই তাকে বাদ দিয়ে হবে--এটা বে-আইনি। এটা সরাসরি তাকে অপমান করা। যে-সব মানুষ আজ সুদীর্ঘ পনেরোটা বছর তাকে 'আজ্ঞে' 'হুজুর' করত তাদের কাছে তাকে হেয় করার মতলব।

বাস ষ্ট্যাণ্ডে জমায়েৎ লোকগুলিকে উদ্দেশ্য করে শোলু রায় বললো। আরে আমি ত এখনো প্রেসিডেন্ট আছি না নাই? আমি জানলাম না আর ব্যোমকেশ জেনে গেলো?

কিছু মানুষ মুখ ফেরালো শোলু রায়ের দিকে। ঠিক কথাই ত—যা-কিছু হয়েছে আগে খবর এসেছে শোলু রায় প্রেসিডেন্টের কাছে—তারপর জেনেছে সবাই।

শোলু রায় জনতার পানে তাকিয়ে বললো, আর এটা কি সোজা কাজ রে? হুঁঃ এই হাজার হাজার লোককে কাজ দিবে আর খেতে দিবে! এই ত আমার ইউনিয়নেই হাজার আট লোক খয়রাতি তালিকায়। গম দেবার কথা—পারছে দিতে? এ সব প্রচার প্রচার। গদীতে বসলে এমন সব কথা বলতে হয়।

ব্যোমকেশের সঙ্গেই থাকে মন্তু। সারাটা দিনই এ গাঁ সে গাঁ ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো আবার দেখা যায় একটা রঙের বালতি আর তুলি নিয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে নানা কথা লিখতে। এই ত ভোটের সময় গাঁয়ের আর কোনো দেওয়াল বাকী রাখেনি সে। হঠাৎ ওকে আবার দেখা যায়—মুখে একটা চোঙা নিয়ে বক্তৃতা করতে।

এই মন্তুই বললো। আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন না?

—আরে রাখ। কাগজে যাই লেখে তাই সত্যি হয় নাকি? সেবার লিখলো—একটা ধাড়ী মেয়ে একেবারে পুরুষ হয়ে গেলো। তোরাই বল। ব্রহ্মার সৃষ্টি একেবারে পাল্টে যাবে?

শোলু রায়ের কথায় অনেকে আমোদ উপভোগ করলো। কেউ একটু হাসলো।

মন্তু বললো, হাঁ যাবে।

—যাবে? সৃষ্টি কর্তার উপর হাত চালাবে মানুষ? শোনহে কেনারাম—জ্ঞানের বহর দেখ। ও রে এ সব কথা ওই বাউরী বাগ্দীদের বলবি, বুঝলি।

মন্তু তেমন জোরের সঙ্গেই বললো, হাঁ বৈলব ত! আপনারাই ওদের ব্রহ্মা দেখিয়ে রেখেছেন, বিজ্ঞানকে জানতে দেননি। ওরা বিজ্ঞান জানলে আপনাদের স্বার্থ হানি হবে। আমরা সেই বিজ্ঞানকেই ওদের ঘরে ঘরে নিয়ে যাব, এই সংকল্প!

এরই উত্তরে শোলু রায় একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বাসের যান্ত্রিক শব্দটা কানে আসতেই মানুষগুলি জমাট-বেঁধে দাঁড়ালো।

শোলু রায় কেনারাম আর সতীশ গিয়ে বসলো সুভাষের দোকানের বেঞ্চটায়।

বাসটা এসে দাঁড়াতেই ব্যোমকেশ মাষ্টার নামলো। সবাই ওকে ছেঁকে ধরলো ওকে। মন্তু বিহারী আরো কয়জন ভীড়টাকে ওই বাথানের দিকে নিয়ে গেলো। মন্তু বললো, এখানে তোমরা সব স্থির হয়ে দাঁড়াও। মাষ্টারদা এসে গেছেন।

ব্যোমকেশই এখন তাদের ভরসা। সবাই আগ্রহ ভরে শুনতে চায় তার কথা। ওর কথার উপরই যেন এতগুলি মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

একটা ছোট-খাটো সভা বসলো বাথানে। সেই সভার এক পাশে ব্যোমকেশ সবাইকে উদ্দেশ করে একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিল। সে বললো, বন্ধুগণ এ সরকার গরীবদের। গরীব খেটে খাওয়া মানুষরাই তাদের নিজেদের সরকার কায়েম করেছে। এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—একটি মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না।

হাততালি দিল সবাই।

ব্যোমকেশ বললো—সরকার কাজের বদলে খাদ্য দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যারাই কাজ করবে, তারাই প্রত্যহ দু-কিলো গম আর একটি করে টাকা পাবে।

—যাদের বুড়ী-বুড়ী, তারা ? সভার মধ্য থেকেই প্রশ্ন এলো।

—যাদের বয়স হয়েছে, যারা অসাক্ত তাদের মত তারা কাজ করবে। একটা আঠারো বছরের ছেলে হয়ত আট ঘণ্টা কাজ করলো—। কিন্তু যাদের বয়স হয়েছে তারা ত আর সে পারবে না—তারা এক ঘণ্টা কাজ করেই পুরো হাজরি পাবে। আর কেউ না খেয়ে মরবে না, এ এক নিদারুণ দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া। আর টোকা হাতে করে কেনারামের দরজায় গিয়ে ধুকতে হবে না!

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো সকলের!

(চ)

সারি এক সময় অনাদরেই দুটো লাউ-এর বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল তার ছোট্ট উঠানের এক কোণে, তাই একদিন মাঠি ভেদ করে অঙ্কুরিত হয়ে কখন পাতা মেলেছে, তাকিয়ে দেখারও সময় হয়নি সারির। যখন সেই নাই লতার দেহ থেকে একটা অবলম্বনের জন্য শীর্ণ প্রত্যঙ্গ মেলে ছটিয়ে যেতে থাকলো তখনি নজর পড়েছিল সারির। সে একটা দড়ি দিয়ে লতাটাকে চালের উপর তুলে দিয়েছে। সেই গাছে সাদা সাদা ফুলও এসেছে। সারি ফুলগুলো অতি আগ্রহে দেখে। সব ফুলে আবার ফল হয় না। যে ফুলে ফল হয়, সে ফুল ফল নিয়েই আসে। এসেছে কয়টা। এবার গোটা চালাটা ঢাকা পড়বে লাউ-এর লতায়। ফল ধরবে অজস্র। নিজে খাবে, বিলি করবে কিন্তু তার আগেই একটা কাজ করবে সে। শত্রু ত কম নেই, তাই শত্রু তাড়াবার জন্য একটা হাঁড়ীতে দৈত্যের মুখ এঁকে দিবে চুণ দিয়ে - কাক পক্ষী কমে না। সারাটা দিন সে তার ছোট্ট ঘরটিকে নিয়েই থাকে। উঠানে গোবর দেয়। দেয়ালে মাটি লাগায়। লাউ-লতার গোড়ায় জল-ফ্যান ঢালে। তবু আর সময় কাটে না। বিহারী ফিরে আসে রাত হলে। তার আর এখন অনেক কাজ। ছোটাছুটি করতে হয় যেতে হয় গাঁয়ে গাঁয়ে। এখন আবার একটা ক্ষেত মজুর সমিতিও হয়েছে সে নাকি মজুরদের দাবি নিয়ে লড়াই করবে। অনেক কথা বলে বিহারী আর কিছু বোঝে না। তবু নীরবেই শুনে যায়। বিহারী খুলিয়া হয়। কিন্তু যখন বিহারী বলে, তুখেও কাজ কৈরতে হবেক বৌ। তখন সে হেসে উঠে। সে আবার কি কাজ করবে? বিহারীর মতন এ-গাঁ সে-গাঁ যাবে নাকি? না কেনারামের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে।

ওর হাসি দেখে বিহারী মুখটা গম্ভীর করে বলে, হাসলি যে?

হাসির কথাই ত কথাটা বলে আবার হাসে সাবি।

চটে যায় বিহারী। সে বলে, হাসির কথা হৈল। মিয়াগলাকে বুঝাবি। মরদরা যা হাজরি পাবেক, তাই আদায় করবি, ত ই-ট হাসির কথা?

ওর মুখ খানা দেখে আর হাসতে সাহস হয় না সাবির। সে অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রীরা মত শুনে। তারপর যদি বিহারী জিগ্যেস্ করে, কি পারবি নাই।

সাবি উত্তর দেয়, শিখাই দিলেই পারব।

এই সব কথাই ভাবে সাবি।

কখনো কখনো আবার এ ভাবনা ভাবারও সময় পায় না। মানি এসে বসে ওর গা ঘেঁসে। মানি গল্প করে। সাবি গুণ গুণ করে ভুলে যাওয়া গানের এক আধটা কলি গায়। কখনো আবার ভাদ্দর গান করে:

ভাদরে ভাদরে ভাদু
কিসকে আলো ভাদরে
বাউরী পাড়ার মিয়া মরদ
উপাস দিয়ে ঠায় মরে।

সাবি বলে, মিছা কথা।

—মিছা কি?

ইবারে উপাস দিয়ে কে মৈরেছে—

সাবি একটুখানি হেসে মানির গালটা টিপে বলে, পুরানো গায়েন লো।

– পুরানো গায়েন গাইবি ক্যানে? ইবারে নোতুন গায়েন বাঁধবি নাই?

দিন আলোই বাঁধব।

ভাদ্র মাস এসেছে। গত বছর ঘরে ভাদ্র আনতে পারেনি এরা। সারাটা মাসই ছিল কান্নায় ভরা। মানুষগুলোর মনে আনন্দ ছিল না। বড়ো বেদনায় কেটেছে মাসটা। মানির ইচ্ছা এই ভাদ্রে ভাদ্র নিয়ে আসবে ছুতার মিস্ত্রীর ঘর থেকে। মনের মত করে ম্যারাপ সাজাবে তারপর বেশ সেজে-গুজে সারারাত ধরে গাইবে গান নূতন গান, তাই মানি সেদিন সন্ধ্যায় সাবি মানির পাশে বসে ওকে পীড়াপীড়ি করছিল নোতুন গান বাঁধবার।

সাবির মনটাও যেন রসালো হয়ে উঠেছিল।

সে বললো, বাঁধব লো বাঁধব। আগে দিন আসুক।

কথাটা ভামির কানে যেতেই, সে জিগ্যেস্ করলো, কিসের দিন আসবেক বৌ!

—ভাত্নর গানের, ঠাকুরঝির তবে ভাত্নর গান বাঁধ্যে দিতে হবেক। তাই বলছিলম, দিন আগুক।

উঠানের মধ্যিখানে একটা খাটিয়া পাতাই ছিল। সেই খাটিয়াটায় ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে এসে বসলো ভামি। সন্ধ্যা হলে আগে যেখানে সেখানে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু ইদানীং মায়ের কোল ছাড়া কিছুতেই ঘুমুতে চাইবে না। তাই ওকে কোলের উপর শুইয়ে রেখে ছেলেটার পিঠে চাপড় মারতে মারতেই জিগ্যেস্ করলো, দিন কি আস্যা যাই বৌ ?

—দেখতে ত পাচ্ছি নাই। আপনার ঘরের দরজা থেকেই জবাব দিলো সাবি।

—বেশ ত বিহারী আল্যেই সেই কথা শুধাস্।

গল্প করবার কত যে অবসর তার স্বামীর। আজ-কাল আসা যাওয়ার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। তারপর যখন সে ফিরে আসে—এখন ওর মুখের পানে তাকালেই আর কোনো কথা বলতে সাহস হয় না। একেবারে শুকিয়ে থাকে মুখখানা, বরং সেই সময় একটু সেবা করতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছাটা মনেই থাকে স্পষ্ট করে আর বলতে পারে না। তারপর কোন্ সকালে উঠে যে চলে যায় জানতেও পারে না সাবি। দুপুরে কোনো দিন আসে, কোনো দিন আসে না। যেদিন দুপুরে আসে—সেদিন আবার পাড়ার মেয়ে-মরদরাও ভিড় করে। মনের মত করে একা পাওয়ার সুযোগই মিলে না। তাই বললো, সে মানুষকে পাবে কখন ?

—ঐ ত আস্যাছে !

একই সাথে মানি আর সাবি মাথাটা ঘুরাতেই দেখলো বিহারী আর ভূষণকে।

সাবি মাথার কাপড়টা মাথায় তুলে দিল।

ওদের দুজনের মুখই হাসিতে উজ্জ্বল।

ভামি খাটিয়াটা থেকে উঠে গেলো।

ওরা এসে বসলো খাটিয়ায়।

শুধা লো বৌ, শুধা। বললো ভামি।

সাবি বললো, তুমিই শুধাও !

—ক্যানে মরদকে শুধাবি তার লাজ কি ?

বিহারীর কানে কথাটা গেলেই জিগ্যেস করলো, কি খুড়ী ?

ভামি ছেলেটাকে কাঁধে ফেলে নিয়ে বললো, তুর বৌ বলে সব নাকি মিছা। দিন নাকি আসে নাই, ই মাসেও শুকাতে হবেক।

বিহারী একবার তাকাল সাবির মুখের পানে। সে মুখে সুখের একটা প্রচ্ছন্ন আমোদ।

বিহারী সাবিকে উদ্দেশ করে খুড়ীকে বললো, বৈলে দে খুড়ী, যে ম্যাষ্টর মিছা বলার লোক লয়। যে কাজ করবেক সেই খাবেক। যে না করবেক তার দিন আসবেক কি?

সাবিও সয়ে যাবে কেন! সেও তার স্বামীকে শুনিয়েই বললো, বৈস্যে খাত্যা আর কে দেয় খুড়শাস্। কেউ দেয় না। কখন থাক্যা কাজ কৈরতে হবেক শুধাও ব্যাটাকে।

—তুরও ত মুখ আছে, শুধা ক্যান্যে। বল্‌রে বিহারী কবে থাক্যা খাটতে যাব বল!

বি, ডি, ও সাহেব এসে দেখে গেছেন সব। চারি দিকটা ঘুরে দেখেছেন। সঙ্গে ছিল ব্যোমকেশ। খবর পেয়ে শোলু রায় এসেছিলেন বি, ডি, ও সাহেবকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে। কিছু আয়োজনও করেছিলেন তিনি—চা খাবার আয়োজন, কিন্তু হয়ত ব্যোমকেশ মাষ্টার সাথে থাকার জন্যই যেতে পারেন নি। সেই ব্যোমকেশই বি, ডি, ও সাহেবকে দেখিয়ে নিয়ে এসেছে—কোথায় কোথায় কাজ হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে এই অঞ্চলে একমাত্র বটার জলের উপরই নির্ভর করতে হয়। মেঘ যদি জল দিল, তবে চাষ হবে। আর যদি জল না দিলো, তবে, সে বছরটায় আর মাঠে হাল নামবে না। তাই চাষের কাজে এখানের মানুষগুলির উপকারে লাগে এমন কাজ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বি, ডি, ও সাহেব আপত্তি করেন নি। ব্যোমকেশ মাষ্টার বি, ডি, ও সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কাঁটা পাহাড়টা। তার নীচেই বিরাট জায়গা—তার পরেই শুরু হয়েছে ধান ক্ষেত। পাহাড়ীর নীচের জায়গায় যদি একটা বাঁদ করা যায় তবে কয়েক শ' বিঘা জমিতে বারোমাস ফসল ফলবে।

বিহারীও সঙ্গে ছিল মাষ্টারের। সে সব কথাই বললো ভামিকে।

সাবিও শুনলো সে কথা।

(ছ)

আরো কয়েকটা দিন পর চিত্রের পরিবর্তন ঘটলো।

সকাল হলেই সাবি পরিপাটি করে মাথা বাঁধে। ভামির মেয়ে মানিও সেই

কেন্দালি মেলায় কেনা ছোট্ট আয়নাটায় মুখ দেখে একবার নিজের মনেই হাসে, তারপর সাবিকে দিয়ে মাথাটা বাঁধিয়ে নেয়। মাথার উপর একটা গামছার একটা প্রান্ত রেখে বাকী অংশটা সামনের দিকে ঘুরিয়ে এনে কোমরে গুজে রাখে। বেশ দেখায় মানিকে। যেন নোতুন বৌ।

ভামি বলে, লে আর সাজতে হবেক নাই। চল ইবারে।

সাবি এ কথার জবাব দেয়। বলে, গলান্দ পাড়ার রসির মা সাজে-জে যায় আর উ সাজবেক নাই!

— আঃ মাথায় ত ঝুড়ি বইবি, তার আর অত সাজ কিসের ?

—ঝুড়ি বইবি বলেই ত সাজব খুড়শাস্। বলে সাবি।

কাজ এক জায়গায় হচ্ছেনা। সারা গাঁ-টা ঘিরিই কাজ হচ্ছে। কোথাও হচ্ছে রাস্তা। কোথাও পুকুরের কচুরিপানা হচ্ছে পরিস্কার, আবার কোথাও শুকনো ডাঙ্গা কেটে তৈরী হচ্ছে বাঁদ। যে যেমন পারে, সে তেমনি কাজ করে, পিছনে চাবুক নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকেনা, কাজ-করাও যে-একটা আনন্দ আছে তা এই প্রথম উপলব্ধি করছে এরা। যার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি শ্রম দাও-স্বাধীন তারা অতন্ত শ্রম দেবার ক্ষেত্রে।

সাবি বলে, জান খুড়শাস্ নামো পড়ার সেই লালু বাউরীর বুড়ী মা সেও যায়।

ভামি অবাক হয়ে যায়। অনেক বয়স হয়েছে বুড়ীর। চলতে গেলে লাঠি নিয়ে চলে —চোখেও ভালো দেখতে পায়না। সে বুড়ী আবার কি কাজ করবে। অবাক হয়ে ভামি জিগোস্ করে, উ যে থুর-থুরা বুড়ী বৌ, উ আর কি কাজ কৈরবেক।

ভামির বিস্ময় দেখে সাবি হেসে উঠে।

— হাসলি যে, বুড়ী লয় ?

—বুড়ী, বুড়ীর মতন কাজ করে।

—কি কাজ ? না-পারবেক মাটি বইতে, না-পারবেক ঘাস ছুলতে। উয়ার মতন আর কি কাজ আছে !

—আছে খুড়শাস্। বন পরিস্কার করবেক বৈস্যে বৈস্যে।

বেরিয়ে আসে ওরা।

ভামি একটু এগিয়ে সাবি যায় মানির সঙ্গে। যেতে যেতে মানি বলে, সেই গায়েন-ট গা ভাজ বৌ !

সাবি বলে, আসবার সময় গাইব। চল্ এখন।

সন্ধ্যা বেলায় ভূষণ একেবারে স্নান করে এসে শুয়ে পড়ে উটানে পেতে রাখা খাটিয়াটায়। দেহটা ক্লান্ত, কিন্তু মনটা সতেজ। সে মিলিয়ে দেখে এই দিনটা আগের বছরগুলির সঙ্গে। মানুষের মুখে মুখে এত যে হাসি ফুটেছে—তা এর আগে কোনো দিনই দেখেনি ভূষণ। এটাও একটা নূতন দৃশ্য। দৃশ্য পাল্টে যাচ্ছে গ্রাম থানার। ফাঁটা পাহাড়ীর নীচের অতখানা পাথুরে জমি কেটে হচ্ছে বাঁদ, ওদিকে বনের পুকুরের মাটি কেটে পুকুরটার চেহারাই বোদলে দিয়েছে। যে রাস্তা ছিল পায়ে হাঁটার অযোগ্য, সেখানে রাস্তার মাটি পড়েছে—এবার মোরাম পড়বে। যে-যা পারো তাই করো, বাধ্য-বাধকতা নেই, চোখ রাঙানী নেই, হাজারি কেটে নেবার হুমকি নেই। এ এক যেন নোতুন জগৎ। আগের কোনো দিনের সঙ্গে এর তুলনা চলেনা।

সেদিনও শুয়ে শুয়ে এই সব কথাই ভাবছিল ভূষণ, এমন সময় ওর পিছনের ঘরটার উঠান থেকে উঠলো একতারার আওয়াজ। কোথায় গিয়েছিল মুরুলি, আবার ফিরে এসেছে। সেদিন কাঁটা পাহড়ার তলেই দেখা।

—কুথায় গেইছিলি এত দিন? জিগ্যেস্ করেছিল ভূষণ।

মুরুলি একটু হেসে জবাব দিয়েছিল, গায়েন কৈর্যো আলম খুড়া। গেইছিলাম শহরে।

কাছেই ছিল ভামি, সে একটু ফিক করে হেসে বললো, তুর গান আবার শহর-বাজারে কে শুনবেক, শুনি।

—শুনেছে গো, শুনেছে।

শহরের সে দৃশ্যটা এখনো মনে জ্বল জ্বল করছে মুরুলির।

যাহরে—কলকাতো শহরে—বিরাট মেলা ভিলুড়ীর, পচু রায়ের ভাগনে নিমু বললো। তোকে মেলায় ঝুমুর গাইতে হবে মুরুলি, যাবি। অমনি মুরুলি রাজী হয়ে যায়। এক দল গিয়েছিল ওরা। বিরাট মঞ্চ। হাজার হাজার মানুষ সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে, হাজার মানুষের সামনে তার একতারা নিয়ে গিয়েছিল মুরুলি,

আমি গাঁয়ের মানুষ
শহরে আস্যাছি
শুনাব গায়েন বাবু দিকে
তাই একতারা নিয়েছি॥

শুনেন বাবু—

রামকাণাই-এর ঘরে সবাই
বাউরী ঘরে ভাত হয় নাই
তাই এক শলি ধান নিয়ে—
আট শলি দিয়েছি
তাতেও দেনা শোধ হয় না
ধরণে ব্যাগার খটেছি ।।

ভামি জিগ্যেস্ করেছিল, বাবুরা কি দিলেক ?

—দিয়েছে। নগদ টাকা। জান খুড়া ইবারে এক-ট ঢোল কিনব, আর এক-ট দল !

তারই প্রস্তুতিই হয়ত করছে মুরুলি। একটা ঢোল নিয়ে এসেছে। আজ কয়েকটা দিন গ্যাড়া আর নোকলাও সন্ধ্যাটা সেখানেই যায়। অনেক রাত তক্ চলে ওদের গান বাজনা।

সেদিন সন্ধ্যাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মুরুলি। যাবেনা, তবু ছাড়বেনা সে। বলেছিল, চল মাইরি। তুমি না-হৈলে আসর জামেনা। তুমি হৈল্যে পাড়ার মুরুব্বি ! যেতেই হয়েছিল ওকে !

মুরুলির ঘরের চালার একটা অংশ বসে গেছে। ভিতরটা ব্যবহার করার কোনো প্রযোজনা হয় না ওর। উঠানের এক পাশে স্তূপীকৃত জঞ্জাল—পচা খড়, পাতা, গোবর। উঠানের উপর এক সময় ঢেকে রাখা পাথর কুচিগুলো উঠে আছে।

—বৈস মাইরি'। বলেছিল মুরুলি।

ভূষণ বসবার আগে চারিদিকটায় তাকিয়ে চলেছিল, কি কৈর‍্যে রাখেছিস সব।

—সব সাফ্ কৈরব খুড়া। আঙনায় গোবর দিব ত্যাখে লিবে পাঁচ দিন পরে.

এক এক ক'রে গ্যাঁড়া আর নোক্‌লাও এসেছিল। ওরা খুশিই হয়েছিল ভূষণকে দেখে।

—লে গ্যাঁড়া ঢোল-ট আন্। আজ লোতুন গান বাঁধ্যেছি, খুড়াকে শুনাব।

প্রস্তুতি হয়ে যাবার পর বিহারী দাঁড়িয়েছিল। একতারাটা কানের কাছে। ওরই পিছনে গ্যাঁড়া। ওর কোলে ঢোল। আর নোক্‌লা দুয়ারী। এক তারার সুর বাজলো—টুং-টুং। মুরুলি তারের সুরের সঙ্গে গলার সুরটা মিলিয়ে নিয়ে গাইলো—

দেখে দেখে নয়ন জুড়ায়।
গরীব বৌ-বিটিদের রূপ খুলেছে
তেল চপ্ চপ্ মাথায় ॥
মরদরা সব বস্-হা হোলেন
ছিষ্টি কাজে লাগে গেলেন
মুরুলি সে ছিষ্টি দেখে
একতারা নিয়ে গান গায় ॥

গানের সঙ্গে নাচ। আর গ্যাঁড়ার দুহাতের আঙুলগুলো ঢোলে বিচিত্র সব বোলের সংমিশ্রণে রাতের পরিবেশকে সঙ্গীতময় করে তুলেছিল।

অনেক কাল গানের সুরই উঠেনি বাউরী পাড়া। আবার উঠেছে। মনটা খুশিতে ভরে উঠেছিল ভূষণের।

আরো মুরুলি গান ধরেছে। সেই গানটাই। ওর গান শুনে সাবি মাঝে মাঝে হাসে! মানি মুরুলির মতন করে গাইবার চেষ্টা করে গুণ গুণ করে। ভামির কিন্তু গানের সুরে কান দেবার সময় নেই।

আজ দুটো চুনো-চিঙড়ি কিনেছে ভামি। কেওটদের সুশালী একটা খাঁচিতে ন্যাকড়া ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছিল ; লিবি বাউরী বৌ! মাছ লিবি? দরজায় দাঁড়িয়ে জিগোস্ করেছিল সুশীলা। এর আগে আগে চুণা-চিংড়ি এমন কি গুগলি পর্যন্ত মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বিকে এসেছে বারণপুর নয় আসানসোলের বাজারে। তাই সুশীলাকে দেখে ভামি বলেছিল, ওমা বারণবাবু যাও নাই ?

—বকতেই ত যাওয়া, তা তুরা ত রইছিস্।

সেই সুশীলার কাছ থেকে মাছ কিনেছে ভামি। ফোড়ন দিয়ে অম্বল করেছে। তিন জনে দু' কিলো গম আর তিনটা টাকা—এই গম দিয়েই খানিকটা চাল নিয়ে এসেছে রাধা মুদির কাছ থেকে। সেই চালের গরম ভাত। রাঁধতে রাঁধতে খিদে পায় ছেলেগুলোর। উনোনের কাছে বসেই থাকে ওরা। ভামি বলে, খাবিই ত—টুক্চা না হয় দিদির কাছে যা যা কাহিনী বৈলো দিবেক ভাজ-বৌ ডাক্ লো মানি।" মেয়েটা উঠে গেলেও, ছেলেটা কিছুতে যায় না। ছেলে মেয়েদের খাইয়ে সে ভূষণকে ডাক দেয়।

সেদিন মুরুলির গান শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পয়েছিল ভূষণ। ভামির ডাক কানে যায়নি।

ভামি এসে ভূষণের মাথায় হাত দিয়ে বললো। ইবারে উঠ।

ভূষণ পাশ ফিরে শুলো।

ভামি আপন মনেই বললো, মা গো মা—কি ঘুম।

বলি খাবে নাই! শুনছ—

কথাটা বলে, একটু হায়' ক'রে জিরিয়ে নেবার জন্যই ভূষণের পায়ের কাছে বসে আচল দিয়ে মুখের ঘামটা মুছলো, আর সেই সময়েই অসাবধানেই হোক্ বা ইচ্ছা করেই হোক—ভূষণের একটা পা ভামির কোলের উপর বসে পড়লো। ভামির মুখে একটু খানি তৃপ্তির হাসি এলো বেরিয়ে। তারপর পায়ের উপর হাতটা বুলোতে বুলোতে বললো, এখন কি পা টিপব নাকি?

যাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা, সে-কোনো জবাবই দিল না।

সাবি বললো, টিপ্‌লে ও কি হবেক?

—ই লো, অত আর লারি। বললো ভামি।

—'লারি' বৈললেই কি আর খালাস্ আছে খুড়শাস্। দিতেই হয়।

—সে দিবি তুই, তিন ছিলার মা দঁখ্যা আর পা টিপতে লারি।

এরও জবাবে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল সাবি, কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বিহারী এসে ঘরে ঢুকলো। সাবির পিঠে পড়ে থাকা কাপডটা তুলতে গিয়ে আর তুললোনা।

বিহারীকে দেখেই ভামি পরিহাস করে বললো, এই ত আস্যাছে, লে ইবারে।

সাবি এ-কথার জবাব না-দিয়ে হাসলো একটু।

বিহারীর এই হাস্য পরিহাসের দিকে মনোযোগ নেই। সে একেবারে ভূষণের উঠানে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো, খুড়া ও খুড়া! খুড়া ঘুমালে নাকি।

বিহারীর হাঁক্-ডাকে জেগে উঠলো ভূষণ। উঠে বললো। দুটো হাতের চেটো দিয়ে চোখগুলো রগড়ে নিলো। তারপর বললো, আয় বৈস্।

বিহারী খেটে এসে চলে যায় নামো পাড়ার রমেশ বাউরীর মনসা মেলায়। এখন আর ওটাকে মনসা মেলা বলে না কেউ। সমিতির অফিস। যদিও ঘরের এক পাশে মনসার মুণ্ডহীন খড়ের দেহটা রাখা আছে। আরো সবাই এসে বসে সেখানে। মনু থাকে। মাঝে মধ্যে আসে ব্যোমকেশ মাষ্টার। ব্যোমকেশ মাষ্টারের এখন অনেক কাজ। সারাটা দিন সাইকেলটা নিয়ে ঘুরেই বেড়ায়। যখন আসে সমিতির অফিসে তখন সমিতির ঘরের অন্য চেহারা। সব এসে ভীড় করে। কে কেমন আছে, খবর নিয়ে ছ্যাড়া চ্যাটাইটার এক পাশে বসে। ওকে

ঘিরে বসে যবাই। সেদিন সবারই মাঝে মাষ্টার বলেছে, এখন থেকে বিহারী এ-ঘর খুলবে। তাপর সেই বন্ধ করে যাবে।

কাজেই ঘরে বসে থাকবার সময় নেই তার।

আজ একটা নূতন খবর শুনে এসেছে বিহারী। সেই খবরটা আরো পাঁচজনকে বলার জন্য সে মহা ব্যস্ত। কিন্তু আস্তে আস্তে বলতে হবে, একেবারে সবটা বললে চলবে না।

বিহারী বসলো খাটিয়ায়। তারপর বললো ভামিকে,—ক্ষিদা পায়্যাছে খুড়ী, কিছু খাত্যে দিবি।

—খা, ভাত হঁয়্যাছে, দিব।

—ভাত ত আমার ঘরেও হঁয়্যাছে খুড়ী, অন্য কিছু খাওয়াবি!

—সে দিন আল্যাই খাওয়াবো।

—খাওয়াবি ত? খুড়া, আজ মাষ্টার আস্যাছিল অপ্পিসে।

কথাটা বলেই চুপ করে গেলো ও। তারপর মানিকে ডেকে বললো, একটা বিড়ি নিয়ে আয় ত তুর ভাজ-বৌ-এর কাছে।

—তা কি বললো ম্যাষ্টর?

—বললো, চোরের হাত হৈত্যে সম্পত্তি ছিনাই লিতে হবেক। পারবি?

ওর কথার অর্থই কেউ বুঝলো না। কি বলতে চায় বিহারী।

ভূষণ বললো, বুঝলম না।

বিহারী বললো যা বলেছিল ম্যাষ্টর: বামফ্রণ্ট সরকার ঠিক করেছে, যাদের জমি নেই এবার তাদের জমি দিবে।

ভূষণ বললো, তাই আবার হয় নাকি!

—কেনে? হয় না কেনে?

—জমি কুথায়?

—আছে খুড়া, আছে। জমি আছে, তবে অন্যের হাতে।

ভূষণ এখনো ঠিক বুঝতে পারলো না। অন্যের হাতে জমি, তা সে জমি আর পাবে কি করে?

—তুই খুড়া জানিস কেনারামের কত বিঘা জমি আছে?

—জানব নাই ক্যানে? জানি।

—মাষ্টারও জানে। সব হিসাব মাষ্টারের কাছে। দু আড়াই শ বিঘা জমির মালিক কেনারাম। এত জমি ওর হলো কি করে? সরকারের ভেষ্টেড্ জমি

নিজের চাষে ঢুকিয়ে নিয়েছে যেমন কেনারাম তেমনি শোলু রায়। তাছাড়া বেনামী জমি আছে একশ বিঘা। এসব জমির অধিকারী সরকার—মানেই গরীব মানুষ। সেই সব জমিই এবার সরকার গরীবদের দিবে।

—তবে হ্যাঁ, জমি বার কৈরতে হবেক আমাদের।

ভামি এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বিহারীর কথাগুলি। ভাবছে এও কি সম্ভব? কোনো দিনই এরা নিজের জমির স্বাদ পায় নি। জীবন কেটেছে পাঁচ জনের লাথি ঝাটা খেয়ে। নেহাৎ যদি কারো কপাল খুলেছে ত সে হয়েছে বাবু ঘরের কামিন। আর ভাবতেও ঘিন্ ঘিন্ করে। রূপ যদি থাকলো হবে দুটো পয়সার বিনিময়ে হতে হয়েছে বিঁদি। আহারে এবার যদি সত্যই চাষীর বৌ হওয়ার ভাগ্য হয়।

ভামি বললো, তা বার কৈরতে হবেক বৈকী! জমির ভাত খাবেক, আর জমি বার করবেক নাই?

ঠিক বৈল্যেছিস্ খুড়ী। ঠিক বৈল্যেছিস।

ভূষণের ঠিক মাথায় ঢুকছে না। বাউরীরা জমি পাবে, তাদের হাল-গরু হবে—এ-যে একেবারে দেবতার উপর হাত।

—তুই ঠিক্ বলছিস বিহারী?

—হঁ হে, হিসাব হৈছে, জে. এল. আর. ও. অফিসে! বললো বিহারী।

—ভূষণ বললো, কি অফিস?

—যেখানে সরকারের জমির হিসাব আছে। তুমি কাল যাবে সমিতির অফিসে, ম্যাষ্টার আসবেক। শুনবে সব নিজের কানে। হৈছে খুড়া হৈছে, ব্যবস্থা হৈছে।

তৃতীয়

(ক)

সংবাদটা আর কয়েক জনের মধ্যে আবদ্ধ নেই। ফিস্ ফিস্ করেও আলোচনা হয় না বাউরীর ঘরের উঠানে সন্ধ্যার অবসরে। কাগজে বেরিয়েছে—বামফ্রন্ট সরকার যত কমই হোক জমি দিবে—যাদের জমি নেই তাদের। পড়েছে এ সংবাদটা শোলু রায়। কেনারাম খবরের কাগজ পড়ে না—পড়ার তার সময়ও নেই। তবু শোলুই কেনারামকে সংবাদটা দিয়ে গিয়েছিল। তখনও তেমন গা

করেনি কেনারাম। কিন্তু যেদিন ওই ব্যোমকেশ মাষ্টার বাথানে সভা করে জানিয়ে দিল বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তটা সেদিন আর অবিশ্বাস করতে পারলো না। এই সভার পরই গ্রামটা কেমন গরম হয়ে উঠেছে। মানুষগুলো কেমন বুক ফুলিয়ে চলা ফেরা করে।

এক রকম সেই দিন থেকেই রামকাকাই শয্যা নিয়েছে। সেদিন বসে থাকতে থাকতেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন রামকানাই। অসুখ নেই বিসুখ নেই, বসে থাকতে থাকতেই জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাও বেঁকে গিয়েছিল; তার পর বাঁ পাছাটা একেবারে অবশ হয়ে যাওয়ায় উত্থান শক্তি একেবারে হারিয়েছেন। পাঁচ মাইল দূর থেকে সরকারি ডাক্তার এসে যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে বলে গেছেন অধিক চিন্তার জন্যই এই রোগ হয়েছে। রোগটা কঠিন এবং কোনো মতেই উঠতে দেওয়া উত্তেজিত হওয়া চলবে না।

কেনারাম বাবাকে চিন্তা করতে নিষেধ করেছে এবং যা-কিছু করার তা সে নিজেই করবে বলে স্থির করেছে।

শোলু রায় একবার করে প্রত্যহ আসেন। খোঁজ খবর নিয়ে যান। সতীশ হাজরা মাঝে মাঝে আসে।

সেদিন কেনারামই ডেকে এনেছে শোলু রায় আর সতীশ হাজারাকে। একটা পরামর্শ করে পন্থা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

—জানেন কাকা, জমি কারো বাপের নয়, জমি দাপের। বললো কেনারাম।

শোলু রায়ও বিশ তিরিশ বিঘা ভেষ্টেড্‌ল্যাণ্ড ভোগ দখল করছেন আজ পনেরোটা বছর। খবরের কাগজে সংবাদটা বেরুবার পরেই তিনি একবার উকীল বাড়ী ঘুরে এসেছেন। তিনি বললেন, দাপা-দাপি করলে ফলটা কি ভালো হবে ভাইপো? তার চেয়ে কৌশলে কাজটা হাঁসিল করা বুদ্ধিমানের কাজ।

সতীশের জমি যাওয়ার ভাবনাটা নেই। ভাবনা যে কাগজ যার হ্যাণ্ডনোট তার কাছে আছে সেগুলো নিয়েই। এখনো এগুলো কেড়ে নেবার আইন হয়নি। তাই একটু নিশ্চিন্ত। সে বললো, আরে রাখো, জমি দিলেই কি রাখতে পারবে ওরা? আমরাই বলে হিম্‌সিম খেয়ে যাচ্ছি। আর ওদের না আছে গোরু না হাল। দেখবে দুটো দিন পরে ওই জমি তোমার কাছেই ফেরৎ আসবে। তবে হ্যা, দুটো দিন ধৈর্য্য ধরতে হবে।

সতীশের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না কেনারাম। একবার যদি কেড়ে নেয় তবে আর সম্মান থাকলো কোথায়। তাছাড়া দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে নিলে

পড়েছিল, তাই পয়সা খরচ করে কাটিয়ে তবে ধেনো জমী করা হয়েছে। এখন এই সমস্ত জমির সঙ্গে পরিবারের মান সম্মান জড়িয়ে রয়েছে—জমি কেড়ে নেওয়া মানেই ত সম্মান কেড়ে নেওয়া। এতকাল মাথা উঁচু করে চলেছে—এখন কি মাথাটা নীচু করে বলতে হবে নাকি ? এ কিছুতেই পারবে না।

সতীশ হাজরার যুক্তিটা ঠিক মনঃপুত হলো না কেনারামের। সে বললো, একবার যদি জমি কেড়ে নেয় তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি ?

—তা কি করবে বল !

—সেই ব্যবস্থা করবার জন্যই আপনাদের পরামর্শ চাইছি। বললো কেনারাম।

শোলু রায় বললো, একটা পথ আছে—

সতীশ আর কেনারাম যুগপৎ তাকালো শোলু রায়ের মুখের পানে।

শোলু রায় অনেক কাল ধরেই বোর্ড-এর বিচার করছে। ছোট-খাটো মামলাগুলো তাকেই বিচার করে রায় দিতে হয়। আইন সম্বন্ধেও খানিকটা জ্ঞান-গম্যি রাখে। কাজেই সে যা বলবে—তা আইন মোতাবিক। আইনে যদি এমন ফাঁক-ফোঁকর পাওয়া যায়, তবে তার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে আত্মরক্ষা করাই ভালো।

—কি পথ ? জিগ্যেস্ করলো কেনারাম।

—হাইকোর্ট থেকে ২২৬ ধারায় একটা ইন্‌জাংশন ! বললো শোলু।

কেনারাম যেন একটা আলো দেখতে পেলো।

—কিন্তু করতে হলে এই সময়, বললো শোলু রায়। তবে একবার ইন্‌জাংশন পেলে—তখন নিশ্চিন্তে তোমার জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারো। তবে হ্যা, খরচ হবে।

—কি রকম খরচ হবে কাকা ? জিগ্যেস্ করলো কেনারাম।

—ভালো ব্যারিষ্টার দিতে গেলে ভালোই খরচ হবে। যদি তোমাদের রাগ হয় তবে না-হয় পরামর্শ করে দেখে আসতে পারি।

খরচের কথায় সতীশ একটু পিছু হটে গেলো। সে যখন খুব বেশী আক্রান্ত হচ্ছে না, তখন অযথা খরচ করাটা যুক্তি সঙ্গত নয়। তারপর শোলু রায়ের হাত দিয়ে যদি খরচ হয় তবে খরচের আর হদিশ পাওয়া কতটা যাবে—সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।

কি আছে। এর মধ্যে ত্থাখো কবে পতন ঘটে।

শোলু রায় মাথাটা নেড়ে বললো—এবারে বোধহয় অত সহজে সেটা হচ্ছে না সতীশ। পতন ঘটাতে গেলে অন্য রাস্তা নিতে হবে—সে কি পারবে?

কেনারাম বললো, পারতেই হবে! শালাদের অভাবের দিনে খাইয়ে রাখলাম আর বলে কিনা—

উত্তেজিত হয়ে উঠলো কেনারাম।

শোলু কেনারামকে উত্তেজিত হতে দেখে বললো, আরে বাবা, পাট্টা দিয়ে দিলেই ত আর জমির দখল নেওয়া হলো না। দখল যার, জমি তার। দখল রাখতে হবে বুঝেছ?

আলোচনা করতে করতে রাত্রি গভীর হতেই সতীশ উঠে পড়লো। তার আবার ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এমনি ঘর থেকে বেরুতে দিতে চায়নি,—দিন কাল খারাপ। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে। বারবার জলদি ফিরতে বলে দিয়েছিল, তাই বললো, এবার আমি উঠি হে।

(খ)

পাট্টা-টাট্টার কোনো মূল্য নেই—জমি যার দখলে থাকবে সেই মালিক—কথাটা রাষ্ট্র করেছিল শোলু রায়ই। আস্তে আস্তে নদীর ঢেউ এর মত শোলু রায়ের ওই কথাটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাউরী পাড়াতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

পাট্টা তারা পেয়েছে। একেবারে সরকারি অফিসের ছাপমারা কাগজ—হাকিমের সই করা। কিন্তু পেয়েও শান্তি নেই। সেবারও নাকি অনেকেই পাট্টা পেয়েছিল। একটা বছর চাষও করেছিল মানুষগুলি। কিন্তু তার পরেই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের হাত থেকে শাসন ক্ষমতাটা কেড়ে নিয়ে, জমিটাও কেড়ে নিয়েছিল। এবারও যদি তাই হয়। কথাটা যখন উঠেছে—বিশেষ করে শোলু রায় যখন বলেছে—তখন হতেও ত পারে। জমিটা কেড়েও ত নিতে পারে।

ভামির যতখানা আনন্দ হয়েছিল কাগজটা হাতে নিয়ে ততখানাই আশংকা হয়েছিল ওই বউনাটা শোনার পর। তাই বিহারীকে একান্তে পেয়ে বললো, হ্যাঁরে, এই যে দুবিঘা জমি পালস, তা আর কাড্যা নিবেক নাই-ত।

বিহারী বললো, মানিকে যদি কেউ কাড়্যা নিতে আসে তুই কি দিয়ে দিবি খুড়ী ?

—তাই কি দিয়ে ছ্যায় রে। মানিকে পেটে ধ'রেছি মানুষ করেছি। তাই কি ছ্যায় ?

—তবে ? জমিও অমনি জানবি খুড়ী। এক হিসাবে পেটের ব্যাটা বিটি হৈত্যেও বেশী। কাড়তে আসবেক নাই কেউ, তাও যদি আসে তবে লড়াই হবেক। জমিকে দখলে রাখতে হবেক। হিম্মত ত দেখা গেইছে শোলু রায়দের। আস্যাছিল ত ক'টা গুণ্ডা নিয়ে পারলেক রাখতে। খুড়ী ইবারে সরকারই যে আমাদের।

এই চৈত্রের রোদ মাথায় করে ভূষণ তার জমিটার মাটি কেটে এসেছে। ভূষণ জানে চাষ কর্তে গেলে প্রতি দু চার বছর অন্তর উপরের মাটিকে তুলে ফেলে দিতে হয়—তবে ফসল ফলে ভালো। উৎপাদন দেড়া হয়। এর সঙ্গে করতে হয় আলগুলির সংস্কার। বর্ষার জলকে ধরে রাখবে ত ওই আল। কেনারাম জমিটাকে চুষে নিয়েছে। দেয়নি কিছুই। ত জমিটা যখন তার হয়েছে তখন মেহনৎ করতে হবে বৈ কী! ভূষণের পাশেই দু বিঘা বিহারীর। বিহারী সবারই জন্য ছুটে দৌড়ে বেড়াচ্ছে তাই ভূষণই তার জমিটাও কামাল করে দিবে বলেছে! সারা রোদটাই মাথায় আর পিঠে গিয়েছে। তার সঙ্গে ছিল মানি। মানির এখন শ্রী এসেছে দেহে। ঝুড়ি ভর্তি মাটি মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাপের সঙ্গে সমানে সমানে খাটে মানি। সেই মানিই মাটি ফেলতে গিয়ে গ্যাড়ার বৌ-এর মুখে কথাটা শুনে এসে বলেছিল ভূষণকে। ভূষণ কোদালটা মাটির ভিতর গেঁথে রেখে জিগ্যেস্ করেছিল। কে বৈল্লেক জমি কাড়্যা লিবেক ? বিহারী ?

—লা।

—তবে ?

—কেনারাম নাকি সদরে শুনে আস্তেছে।

ভূষণ বলেছিল। তাই বল। লে এই ঝড়া-ট উই ফাঁক্-টয় ফেলে দিয়ে চল যাই।

তখন কথাটার উপর গুরুত্ব না দিলেও, মনটা ধুক্-পুক্ করছিল ভূষণের। যদি সত্যিই আবার কেড়ে নেয় তবে সে কি করবে ? বৃথাই হবে এই ঘাম-ঝরানো। ঘরে এসে সে কাকেউ কোনো কথা বলেনি। কাকেউ জিগ্যেস্ও করেনি। ঠিক

সংবাদ দিতে পারে তিনটি মানুষ—এক মাষ্টার, দুই ঘনু ঠাকুর আর তৃতীয় জন বিহারী। মাষ্টার ত আরো দশটা কাজে ব্যস্ত। মনু ঠাকুর চষে বেড়াচ্ছে এই পাঁচটা গ্রামে—হাঙ্গামা একটা না একটা লেগেই আছে, গাঁ-টায় থাকে বিহারী। সমিতির অফিসে যায়। মাষ্টার ওর সঙ্গে সব আলোচনা করে। আজকাল অনেক নূতন নূতন কথা বলে বিহারী। সে-সব কথা আগে শুনেনি! এমন নাকি দেশ আছে—যেখানে খাবারের জন্য, রোগে চিকিৎসা করানোর জন্য, থাকবার জন্য কি ছেলে মেয়ের পড়াশুনার জন্য মানুষকে ভাবতে হয় না। সব সরকারের ভাবনা।

ভামি বলে। তাই আবার হয় নাকি?

—হয় কি, হঁয়্যাছে।

—কি কৈর‍্যা হৈলো?

—লড়াই কৈরে। লড়াই কৈর‍্যা দূর কৈরে দিয়েছে জমিদার-জোতদারকে।

যারা শুনে তারা হাঁ করে গিলে ওর কথাগুলি।

বিহারী বলে, আমাদেরও তাই কৈর ত হবেক। লড়াই করতে হবেক! বুঝেছিস্?

ভামি হেসে উঠে। পাশে বিহারীর বৌ সাবিও মুখে কাপড় দিয়ে হাসে।

আমোদ অনুভব করে ওরা।

ভামি বলে, শুন্ সাবি বৌ, লড়াই কৈরতে হবেক। পারবি ত?

সাবি বলে, মরদরা যখন পারবেক, তখন আমরাও পারব।

—দুধ ভাত খাবি, আর লড়াই করবি নাই ক্যানে? যে না লড়বেক সে মরবেক। তাকে কেউ দেখবেক নাই, বুঝলি। সাবির দিকে তাকিয়ে বলে বিহারী।

এখন বিহারীর মুখ থেকে বৌ-বিটির উপমাটা শুনে ভূষণও খানিকটা বল পেলো। নিজের ইজ্জৎ নিজেকেই রাখতে হবে।

ঠিক্ বলেছিস্ বিহারী। আরে এক আধজন ত লয়। সারা দেশে এই কাণ্ড কি বল। জমি কাড়তে আল্যা সারা দেশে একট কুরুক্ষেত্র হঁয়্যা যাবেক নাই? কি বল।

—হবেকই ত। বাঁচতে হৈল্যে লড়তেই হবেক খুড়া। এখন উ সোব কথার ছাড়ান দাও। শুন খুড়া আরো সব কি কি সরকার দিবে।

বিহারী বললো ঠিক তেমনি ভাবেই যেমন ভাবে, মাষ্টার বক্তৃতা দেয়, পশ্চিমবঙ্গ

সরকার গরীব চাষী ক্ষেত মজুররা যাতে ব্যাংক থেকে শতকরা চার টাকা সুদে টাকা পায় চায করার জন্য তা দিবে, আবার এই টাকা ঠিক সময়ে শোধ করে দিতে পারলে সুদের টাকাটা সরকারই দিয়ে দিবে।

—বলিস কি রে?

—হাঁ, ইবারে লাও ফুর্তি কৈর‍্যা চাষ কর।

—এটাও একটা ভাবনা ছিল। সতীশ হাজরা মাঝে মাঝে যায় ক্ষেতের মাথায়। দু চার জনকে টোপও দিয়েছে। বলেছে, সরকার না হয় জমি দিল, কিন্তু জমি হলেই ত চাষ হয় না, ছিতার চাই—ছিতার মানে বদল লাঙল বীজ। আর এ সব কিনতেই হবে। তা বলেছে, যা'বি যাবি, যা পারি দিব।

ভূষণের সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল একদিন সতীশ হাজরার মাঠ থেকে আসছিল ভূষণ। সামনা-সামনি পড়ে যেতেই অনেক দিনের পুরোনো অভ্যেসটাই ওর মাথাটা একটু নামিয়ে দিয়েছিল।

সতীশ তৎক্ষণাৎ বলেছিল, তা কেমন আছিস্ ভূষণ?

—ভালই বাবু আপনাদের আশির্বাদে। বেশ নম্র ভাবেই জবাব দিয়েছিল ভূষণ।

সতীশ বলেছিল, তোরা ভাল থাকলেই ভালো। তা জমি ত পালি। এবার হাল-বলদ ক'রে নে।

—সেই ত—করতেই হবে টেনে টেনে বলেছিল ভূষণ।

—নে বিড়ি খা।

একটা গোটা বিড়ি দিয়েছিল সতীশ। ওর সেলাইটা দিয়ে ধরিয়েও দিয়েছিল। সতীশ ভূষণের পাশে পাশেই হেঁটে আসছিল। মাঠের রাস্তায় লোক-জন বড়ো একটা চোখে পড়েনি। রাস্তাটা ফাঁকাই ছিল। সতীশ চলতে চলতেই এক সময় বলেছিল, এসেছিল জানিস, নামো পাড়ার দু চার জন এসেছিল, হাল গোরু কিনবে, তা আর কি করি, বলেছি, দিব বলেছি। তা তুই আসবি এক দিন। জমি পেয়েছিস্ চাষ কর। আসবি, বুঝলি?

বিহারীর কাছ থেকে সরকারি সাহায্যের কথাটা জানতে পেরে মন থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেলো তার। সে বল্লে, মাষ্টার বৈলেছে নাকি রে?

—কাগজে বিরাইছে খুড়া। মাষ্টর সভা করেই সবাইকে বৈলে দিবেক। খবরদার—সতীশ হাজরার খপ্পরে পড়বে নাই।

—সাধ কৈর‍্যা কেউ কি আর পরে রে, তবে ইবারে কে আর যাবেক বল ?

বললো ভূষণ।

সাবির রান্না হয়ে গেছে সেই কোন্ সন্ধ্যায়। ভাতের হাঁড়ি নিয়ে বসে আছে সেই সন্ধ্যে থেকে। সাবির সাধ স্বামীকে সামনে বসে আজ খাওয়াবে। ইদানীং এ সুযোগটা বড় একটা আসে না। সকালে কোনো দিন যদি ঘরে ফিরে তবে খায়, নয়ত বেশীর ভাগ দিনে খাওয়াই হয় না ওর। রাতের বেলাতেও সেই অনিয়ম। কখন যে আসে আর কখন যে খায়, জানতেও পারে না সাবি। আজ যখন সন্ধ্যাতেই এসেছে, তখন খেয়ে নিলেই ত হয়।

সাবি ভামিকে বললো, ইবারে খাত্যা বল কেন্নে খুড়ী।

দাঁড়া এখন চাষের কথায় মাতেছে। বললো ভামি।

সাবি বললো, খায়্যা নিয়ে সারা রাত গপ্প হোক ক্যান্নে।

—বল্ সে কথা। বলি ও বিহারী, সাবি বৌ যে বৈস্যে আছে।

—হঁ যাই—

বিহারী উঠতে যাবে, এমনি সময়েই বিহারীর ঘরের দরজায় বেজে উঠলো এক তারার টুং টুং শব্দ।

—ওই শুন—বললো সাবি। অর্থটা এই এবার ঘুরলি এসে আসর বসালেই আর উঠবার নাম করবেনা কেউ।

আজকাল আবার জোয়ান মানুষগুলো সন্ধ্যা থেকে আসর জমায়। বিহারী গান গায়, গ্যাড়া ঢোল বাজায়, মাঝে মাঝে দু চার জন মেয়েকেও দেখা যায় ওই আসরে।

ভূষণের মনে অনেক দিন আগের চিত্রটা ধরা দেয়, এই বাউরী পাড়ার মানুষগুলো সন্ধ্যায় বিশু মোড়লের পচাই-এর দোকান থেকে ফিরে বসত বোকা বাউরীর উঠানে। গোলকা একটা ঢোল নিয়ে নিজেই গাইত ওরই তৈরী করা গান। সে সব গান আজ আর কারুরই মনে নেই। তবে মনে আছে, গাঁয়ের নদা চৌকীদার একবার সারা গ্রামটা টহল দিয়ে এসে বলত। ইবারে রাত যে শেষ হবেক রে—

সেই গান। আর সেই সুর আবার শোনা যাচ্ছে। আবার পাড়ার মানুষগুলির মনে সুরের ছোঁয়া লেগেছে।

—কই গো খুড়ী।

ও এলেই ওর সঙ্গে গান আসে, আনন্দ আসে।

ঘরে ঢুকেই ভূষণ আর বিহারীকে পাশা-পাশি বসে থাকতে দেখে মুরুলি বললো, দিলম রস্‌ভঙ্গ করে !

ভূষণ বললো, আয় রে মুরুলি !

—আজ খুড়ী। তোর কাছেই খাব। বেটা সহজ ভাবে বললো বিহারী।

মাঝে মাঝে এমনি হঠাৎ করে আসে, যার যা থাকে তাই খেয়ে যায়। সংসারে কিছুটা কম পড়ে তা হলেও কিছু মনে করে না ভামি।

ভামি কোনো উত্তর দেবার আগেই ভূষণ বললো। খাবি বৈকী !

—ছুটু মাষ্টার কিছু বলছ নাই যে মাইরি ?

—গেইছিলি কুথায় ? জিগ্যেস্ করলো বিহারী।

—শুন তবে,—গেইছিলম উপর পাড়ায়—তা কি দেখলম শুন, তুমাদের দুজনের মতনই—

কেনারামের ভিতর-ঘরে
বসে আছে শোলু রায়
দেখে আইলস উপর পাড়ায় ॥
রামকানাই-এর বাক বন্ধ
একটা চোখ হয়্যাছে অন্ধ
ই-পাশা উপাশা লড়তে লারে—
হাগে মুতে বিছানায় ॥

মুরুলির গান শুনে হেসে উঠলো সবাই।

সাবি মুখের কাপড়টা সরিয়ে বললো, খায়্যা লেক গো, তারপর লাচ গান যা হবেক হোক।

সেই ভালো। বিহারীকে আবার এখুনি বেরুতে হবে। একবার যাবে সমিতি ঘরে। এই সময়টাতেই আসে মানুষ জন। মাষ্টার নেই, মনু ঠাকুর গেছে ভরতপুর জমির দখল নিয়ে একটা ঝগড়া বেঁধেছে। পুলিশ দারোগাও গেছে সেখানে।

কখন কি খবর আসে কে জানে !

ভামি বললো, লাও তুমরা এই ঠ্যানেই বৈস। দে লো সাবি, মরদের ভাত আন্যা দে !

সাবির বড়ো ইচ্ছা ছিল সামনে বসে খাওয়াবে বিহারীকে। সেই সাধে যখন বাধা পড়লো, তখন মনটাও মুষড়ে গেলো তার। সে বললো, এই ঠ্যানে আছে লিয়ে যাও।

গলার স্বর শুনেই বুঝলো বিহারী, সাবির মেজাজটা। ইদানীং মাঝে মাঝে ওর কথায় একটা ঝাঁজ্‌ অনুভব করে বিহারী। এর কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না। মনে করে জিগ্যেস্‌ করবে, কিন্তু ভুলে যায়। জিগ্যেস্‌ করা আর হয় না।

বিহারী বললো, আমি ওই খ্যানেই না-হয় খাই-গা।

—তবে তাই যা। বললো ভামি।

সাবি বললো, ওই খ্যানেই বসতে বল খুড়শ্যাস আমি দিয়ে আসছি।

(গ)

খবরটা কাগজে বের হয়েছিল, এবার সবাইকে ডেকে সভা করে ব্যোমকেশ মাষ্টার জানিয়ে দিল ঋণের কথা,—যার যার দরকার তাদের দরখাস্ত সমিতির অফিসে দিতে হবে, এবং সমিতিই ঋণের বন্দোবস্ত করে দিবে। এই চাষের মরশুমেই যাতে চাষ করতে পারে, তার সব ব্যবস্থাই পাকা।

এই সব দরখাস্ত করে জমা দিতে আর ঋণ পেতে মাস খানেক লেগে যায় মানুষগুলির। কেউ কেউ সে ঋণের টাকায় বলদও কিনে আনে।

এ সব আর গল্প নয়। সবারই চোখের সামনে ঘটছে। যে মানুষগুলি সারাটা বছর কেনারাম সতীশ শোলু রায়ের দরজায় ধর্না দিত তারা এখন বেশ গট্‌গটিয়ে চলে। বাবুদিগে দেখলে ভয়ে ভক্তি প্রদর্শনের অভ্যেসটা এরা শুধরে নিয়েছে। এইটাই ভয়ের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে কেনারাম সতীশ-শোলুরায়ের কাছে। মান-ইজ্জৎ ত যেতেই বসেছে, এবার ধন-প্রাণ, তাও বুঝি বিপন্ন হবে। মনে একটা দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকে! দুশ্চিন্তা হবারই কথা। বিশ তিরিশ বিঘা জমি ত কম নয়, জল না হলে বিঘা পিছু সাত আট মন ধানের আয়; সেটা চলে গেছে। রাখতে ত পারেনি, অনেক ছুটা-ছুটি করেছে, উকীল বাড়ী, কলকাতা কেউ ভরসা দিতে পারেনি। তাহলে আর, মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার পথটা কোথায়? ভদ্র লোকের খোলসটা, আর যাই হোক, এখন আর বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে বর্ম হিসাবে কাজ করবে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় এ গ্রাম থেকে চলেই যায়। কথায় কথায় একদিন মমতার মাকে বলে শোলু রায়; এ গাঁয়ের বস্তা উঠল বুঝি মনির মা!

মমতার মাও বুঝেন যে একটা পরিবর্তন এসেছে। পুকুর ঘাটে রাস্তায়, গৃহস্থের বাড়ীতে এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা নিয়ে আলাপ হয়, নানা জনের কাছে নানা

কথা শুনে। তবে ওর স্বভাবটাই হলো, চুপ-চাপ থাকা। বড়ো একটা কথাও বলে না কারো সঙ্গেই। কারো বাড়ী গিয়ে গল্প গুজব করার অবসর ওর নেই। মমতার মা শোলু রায়ের কথাটা শুনে বলে, যা ভাল বুঝ, তাই কর। কিন্তু যাবে কোথায় ?

তাও বটে—যাবে কোথায় ? যেখানেই যাক্—সেখানে ত যত টুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে. তা নিয়ে ত যাওয়া যাবেনা, যেতে হলে বিক্রী বাটা করে যেতে হয়। কিন্তু তাও মুস্কিল, কিনবে কে ? এক আছে মেয়ের বাড়ী। মমতা অবশ্য চিঠি লিখেছে, কিছু দিন উখানে গিয়ে থাকতে, মেয়ের প্রস্তাবটাই করে শোলু রায়। মমতার মা বলে, মেয়ে-জামাই-এর ঘরে আবার যায় নাকি ? আর ক'দিন তারা রাখবে ? তার চেয়ে-গাঁয়েই থাক। উয়ারা ত আর তোমার ঘরে ডাকাতি করতেও আসেনি, খুন করতেও আসেনি।

না তা আসেনি। তবে আসবে না যে তার নিশ্চয়তা কি ? এখন, কেউ না জানুক শোলু রায় ত আর নিজের মনকে অবিশ্বাস করতে পারে না—এখন সত্যই একটা ভয় পেয়ে বসেছে তাকে ; সে ভয়টা প্রাণের ভয়। কিন্তু বাইরে থেকে মনের এই আতংকিত অবস্থা বোঝ যায় না। রাত্রি হলে আর বড়ো একটা বাইরে বেরোয় না শোলু রায়।

সেদিন যেতেই হলো। কেনারাম তার লগদীকে পাঠিয়েছিল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

অবস্থাটা ভালো নয় রামকানাই-এর। একটা অঙ্গ পড়ে গেছে। বিছানাতেই শুয়ে থাকেন। কথা বলার ক্ষমতাটুকু নেই, মানুষও ঠিক আগের মত চিনতে পারে না। অবশ্য চিকীৎসার কোনো রকম ত্রুটি করেনি কেনারাম। ডাক্তার দেখাচ্ছে। ওষুধও চলছে ; কিন্তু ডাক্তার বলে গেছেন—বয়স হয়েছে, এ সময় সেরিব্রাল এ্যাটেক্ মারাত্মক।

হয়ত অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে, তাই ডাকতে পাঠিয়েছে কেনারাম।

লগদীর সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই কেনারাম বললো, এ ত আর সহ্য করা যায় না কাকা।

শোলু রায় বুঝলেন আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে. ঘটনাটা কি, সেটা জানার আগে শোলু রায় জিগ্যেস্ করলেন, কেমন আছেন রামকানাইদা।

ওঁর জন্যে আর ডাক্তার কি আছে। আছেন অমনি। যে কটা দিন আছেন। এখন আর ওঁর জন্য ভাবিনা কাকা, কিন্তু দিনে দিনে এ হচ্ছে কি ? শেষে কি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে নাকি ?

শোলু রায় বুঝলেন,—এমন কিছু ঘটেছে যা মহামানী কেনারামকে ভাবিত করে তুলেছে।

—কি হয়েছে, কি ?

হয়নি কি ? তু করলে যারা এসে লেজ নাড়ত, এখন তারা ভেক্ ভেক্ করে ? কাকা, আমি সত্যি বলছি, গ্রামে থাকতে হলে, আগের মতই থাকতে হবে, এবং আমি তা থাকবোও। এই বলে রাখছি। বললো কেনারাম।

বেশ তাই ত থাকতে হবে বাবা। তাই ত থাকবে। কিন্তু কি হয়েছে বলবে ত ?

বললো কেনারাম যা বললো তা হলো এই :

গোয়াল ঘরটা আবার নূতন ক'রে করাবে বলে, আগেই বলে রেখেছিল রোখু ছুতারকে। কাঠ রয়েছে, নূতনটা বসিয়ে দিয়ে যাবে, এখন না করলে, ছাদন আছে এরপর তাই লগদীটাকে পাঠিয়েছিল রোখুকে ডেকে আনতে। ও আসেনি। শোলু রায় বললো, আসে নি কেন ? তুমি ডাকলে আর এলো না—এ যে নূতন কথা ! কি বললো ?

বলেছে এখন সময় নেই, যেতে পারবে না।

শোলু রায় বললো, তাই বল। সময় হবে কি করে এখনত সে হাল মই করতে লেগেছে। অভি কামার শালাতেও আগুন জ্বেলেছে। হালের ফাল করছে সে। জানি,—সবই কানে আসে। আবার অভি বলে কিনা সারা বছর ত বসেই ছিলম বাবু, এখন দুটা পয়সা যদি পাই।—শুন কথা। এ-সব ছোট-খাটো কথায় কান দিওনা বাবাজী। সময়টা ত এখন বুঝতেই পারছ।

কেনারাম মাটিতে থাপ্‌পড় মেরে বললো, এ সময় যদি না-ফিরাই তবে আমার নামে কুকুর পুষবেন কাকা, তবে হ্যাঁ, আপনাকে সাহায্য করতে হবে।

শোলু রায় চুপি চুপি বল্লেন, তা ত করতেই হবে। তবে—জান এ—মনসা চিন্তিতং কার্য্যং বচসা ন প্রকাশায়েৎ। কথাটা আমি খুব মানি বাবাজী। হবে হবে—সব হবে—চল দেখে আসি দাদাকে।

(ঘ)

—মানি ! ও মানি !

ভামি শাড়ির আচলটা কোমরে বেঁধে উঠানটার উপর গোবর জল দিয়ে ঝাটা দিয়ে নিকোতে নিকোতে ডেকে উঠলো।

অন্য পক্ষ থেকে কোনো জবাব না-পেয়ে নিজের মনেই বললো, থাক্যা থাক্যা কুথায় যে-যায় ? এত কাজ পৈড়ে রইছে - সেদিক হঁস্ নাই।

কাজ বেড়েছে এখন ভামির। আগে প্রায় সারাটা দিনই বসে শুয়ে কাটত তার, এখন একটু হাঁয় করে বিশ্রাম নেবার সময়ও নেই। সকাল থেকে কাজ-আর কাজ।

তখন ছিল একটা ঘর,-না-ছিল ঘরের চার পাশের দেওয়াল। বলতে গেলে আশ্রয় ছিল না। এখন ঘরটার শ্রী ফিরেছে। একটা ঘরের জায়গায় উঠানের উত্তর দিকে আরও একটা ঘর তুলেছে ভূষণ আর বিহারী। বলদ এনেছে ওরা। বিহারী যায়নি। ভূষণ হাটে নিয়ে এসেছে। ওই বলদ জোড়াটার জন্যই ঘর।

ভামি ঘুরতে ফিরতে বলদ জোড়াটার দিকে তাকিয়ে থাকে !

সেদিন বলদগুলি এনে এই উঠানে ছেড়ে দিয়েছিল ভূষণ। পাড়ার লোক দেখতে এসেছিল। ভামি তেল সিঁদুর দিয়েছিল ওদের কাস্তের মত সিং গুলোয়। চক্ চক্ করছিল দিনের আলোয়। বলদগুলোকে ছেড়ে দিতেই ঘরটা চিনে নিতে দেরী হয় নি ওদের। বেশ স্বচ্ছন্দেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল উঠানে। পাঁচিল ধারে ধীরে ধীরে ছোট ছোট কচি ঘাসগুলি কেমন টেনে টেনে খাচ্ছিল। এই দেখেই ভূষণের ব্যাটা বাইরের থেকে কয়েক মুঠি ঘাস এনে মুখের কাছে ছুড়ে দিয়ে বলেছিল। লে খা। গোরুগুলোও তেমনি শান্ত ! ছেলেটা সাহস পেয়ে একবার ওদের গায়ে দূর থেকে হাত দিয়ে বলেছিল, আমি চরাতে নিয়ে যাব মা।

জগু অনেক কাল মাহিনাদারি করছে। গোরুর দাঁত দেখে গোরুর বয়স বলে দিতে পারে। কোন্ বলদে চাষ হবে, কোন্ বলদে হবে না, তাও বলতে পারে। আবার গোরুর অসুখ-বিসুখ হলে ওষুধও দেয়। সেই জগুকে ডেকে এনেছিল ভূষণ। জগু চোয়াল তুলে দাঁতগুলি গুণে নিয়েই বলেছিল, নারে নোতুনই বটে। তারপর ওদের শিরদাঁড়ায় হাত দিতেই লাফিয়ে উঠেছিল বলদ জোড়াটা।

—ভালোই হবেক, তবে বাপু যত্ন করা চাই।

—তা ত করতেই হবেক। বলেছিল ভামি।

যত্নের ত্রুটি হবার জো নেই ভামির কাছে। যাকে বলে চোখে চোখে রাখা—তাই রাখে। সকাল হলেই গোয়াল থেকে গোবরটা বের করে আনে—কিছুটা রেখে দেয় ঘুঁটে দেবার জন্য, কিছুটা আবার বাইরে আস্তা কুড়ে ফেলে দিয়ে

আসে—তারপর তাদের ধোয়া মোছা, মাড়-জল খাওয়ানো—সবই প্রত্যহ নিজের তত্ত্বাবধানেই করায়।

এই দেখে দেখে সাবি হাসে। বলে, ব্যাটাকেও যে এত যত্ন কর নাই খুড়শাস্।

ভামি এ কথার জবাব দেয়, উয়ারা যে অ-বলা জীব লো, না-যত্ন করলে, ইয়াদের উপর ভরসা।

আবার মেয়ের নাম ধীরে ডাকলো ভামি।

সাবি জানে কোথায় গেছে মানি। আজ কাল মানির দেহের যেমন পরিবর্তন হয়েছে, মনেরও তেমনি। দেহেরটা এদের পড়ে—মনেরটা অনেকের নজর পড়েনা। মানি এখন আর সেই হাঁটু অবধি শাড়ী পরতে পারে না, তার লজ্জা লাগে। শাড়ীর তলে আবার শায়া চাই। গায়ে ভদ্রলোকের বৌ-বিটির মত ব্লাউজ। তার উপর বিকেল হলেই সাবির কাছে আসে মাথা বেঁধে দেবার প্রয়োজনে। সাবি জানে—'আট সিকুটি' 'পোলা সিকুটির' বাঁধা বাঁধার কৌশল। একটু চুল থাকলেও—বাঁধার কৌশলে বেশ বড়োসড়া হয় বাঁধনটা। ঘাড়ের উপর থেকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেক খানা জায়গা নিয়ে থাকে।

একদিন সাবি বলেছিল, চোখে কাজল নিবি নাই? আর কপালে এক-ট টিপ্ দিয়ে দিই।

মানি এর প্রতিবাদ না-করে, একটু হেসে বলেছিল, না।

—না ক্যানে লো ঠাকুরঝি, আরো ভালো দেখাবেক। সায় দিয়ে দি। কিন্তু ঠিক বলত, কার মন ভুলাতে যাবি?

—মন ভুলাতে আবার যাব কি।

—জানি লো জানি—

এর জবাবে সাবির মুখের উপর ডাগর ডাগর চোখগুলো রেখে একটুখানি হেসেই চলে গিয়েছিল।

ভামির হাঁক্-ডাকের জবাবে সাবি বললো, দিন রাত কি ঘরেই থাকবেক নাকি খুড়শাস্?

—বলদ গলা বাঁধা আছে ঘাস জল দিবেক ত। এই গ্যাখ্ গোরুর পেট! বললম নয়নজুলির ধারে নিয়ে যা-তা লয়। আজ-কাল কথাই শুনে না।

সাবি উঠে এলো নিজের দাওয়া থেকে। বললো, এই ত ঘাস আছে খুড়শাস্।

—উ গলা কতক্ষণ, গোরুর খাওয়া—বৈলে কথা!

সাবি ওর উঠান থেকে এক বোঝা ঘাস এনে দিল।

ঘাস দিয়ে ফিরে আসতেই নজরে পড়ল মানিকে। ভামি আসছে। এঁকে বেঁকে গরবিনীর মত আসছে মানি। ওকে দেখে একটু হাসল সাবি। যৌবনের উচ্ছলতা মানির সারা অঙ্গে ঘিরে যেন খেলা করে। সারা অঙ্গের প্রতিটি প্রতঙ্গ যেন ব্যাকুল হয়ে উঠে। মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয় তাকে।

সাবি এগিয়ে এল। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। মানি আসতেই জড়িয়ে ধরলো সাবি। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললো, কুন্ দিন ধরা পড়ে যাবি ঠাকুরঝি!

মানি কিছু বললো না। সে শুধু তার ডাগর ডাগর চোখ মেলে তাকালো সাবির দিকে।

—দেখা মিলল?

মানি এ কথায় হেসে উঠলো। প্রসন্নতায় ভরা মুখ।

সেই কাজের বদলে খাবারের কাজে দেখা হয়েছিল নামো পাড়ার বোটু বাউরীর ছেলে পানুর সঙ্গে। এমনি ত অনেকই অনেক সময় দেখে, কিন্তু সে দেখার মধ্যে কি ছিল তা আজো জানেনা মানি। না দেখতে পেলেই মনে হতো দিনটাকে অর্থহীন! তায়পর একদিন বলদগুলো এনে বিকেলে ওগুলিকে মাঠে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা মানির উপরই ন্যস্ত হলো। আর সেই সুযোগে চোখের দেখা মানুষটা যেদিন মনের মানুষ হয়ে গেলো, সেদিনটার কথা বলেছিল মানি সাবিকে। সাবি জিগ্যেস্ করেছিল, তারপর? চুপ করলি ক্যানে? পানু ডেকে গান গাইলো, আর তুই গানে তার জবাব দিলি?

—না।

—তবে?

তারপর যা বলেছিল, তা হলো এই:

মানি রামা লখ্নাকো (বলদ দুটোর নাম) ছেড়ে দিয়ে আপন মনে ঘুঠিং খেলছিল, বেলা পড়ে এলে দেখেছিল বলদ দুটো কোন্ সময়ে চোখের বাইরে চলে গেছে, তখন তাদের নাম ধরে ডাকছিল মানি, আর সেই সময়েই পানু ডি-পাহাড়ীর জঙ্গল থেকে এক বোঝা ঘাস মাথায় নিয়ে নামছিল। মানি জিগ্যেস্ করেছিল ওর রামা-লখনাকে সে জঙ্গলের মধ্যে দেখেছে কিনা। কিন্তু পানু এমনি দুষ্ট-সে কোনো জবাব না দিয়ে চলেই যাচ্ছিল, তখন মানি বলেছিল, কালা নাকি হে? শুনতে পাইছ নাই?

পান্থ বলেছিল শুনতে পাবেনা কেন, কিন্তু আর সময় নাই। গোরুগুলি বনে আছে কি না তা বলবার সময় নাই—এ আবার কেমন কথা।

—বলদগলাকে বনে দেখ নাই? জিগ্যেস্ করছিল মানি।

—দেখব নাই ক্যানে?

—কুথায় আছে?

—পাহাড়ে। কথাটা বললেই চলে যাচ্ছিল পান্থ।

মানি আবার তাকে বলেছিল, চল দেখাই দিবে।

এবার পান্থ মাথার বোঝাটা নামিয়ে বলেছিল, আমার সময় নাই, দেখছিস্ নাই সন্ঝা দঁখ্যা যাছে!

হাঁ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, ঠিক সময়ে গোরুগুলো নিয়ে ঘরে পৌছাতে না-পারলে। তার মা কৈফিয়ৎ করবে, তার বাবা ভাববে তাই মিনতি করেই বলেছিল, চল দেখাই দিবে।

—কি দিবি? ডাগর ডাগর চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল মানির চোখের উপর। মানি মাথাটা নামিয়ে নিয়ে চলেছিল। দিব আবার কি?

—কিছু না-দিলে আমিই বা তোর তরে বলে যাব ক্যানে? কথাটা চলেই আবার ঘাসের বোঝাটাকে মাথায় তুলতে গিয়েছিল, আর ঠিক সেই সময়েই মানির হাতটা ধরেছিল পান্থ—আর তখুনি সারা শরীরটায় একটা কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল মানির। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার ক্ষমতা ছিলনা। দাঁড়িয়েছিল একটা পাথরের মত, কতক্ষণ এমন ভাবে ওর হাতটা পান্থর হাতের মধ্যে ছিল জানেনা মানি। হাতটা ছেড়ে দিতেই মানি বলেছিল, অমন কৈর‍্যা হাত-ট ধরলে ক্যানে?

সে বলেছিল। তোর কাজ কৈরে দিব—, তুই থাক এই থ্যানে আমি আন্যা দিছি তোর রাম-লখনাকে।

ঘরে ফিরে এসেও কারো সঙ্গে কথা বলতে পারেনি মানি। মনটা যেন কেমন হয়েগিয়েছিল। একটা আনন্দ একটা আশংক্ষা তার সমস্ত দেহে-মনে একই সঙ্গে তাদের প্রভাব ফেলেছিল। আর সেই সময়েই সাবি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস্ করছিল, কি হয়েছে তার।

কি লো ঠাকুরঝি, আজ কি কথা হৈল? আয় বলবি আয়। মানির মুখ থেকে প্রথম জীবনের এই ভালোবাসার কথা গুলি শুনতে ভালো লাগে সাবির, মানির মধ্যে সে যেন নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করে, আর তখুনি বুকখানা কান্নায়

ভরে যায়, বিহারী যে তাকে অবহেলা করে, তা নয়, বরং শরীর খারাপ হ'লে খোঁজ নেয়। ওর জন্য যে না খেয়ে রাত জেগে থাকে,—তার জন্য বেশ বুঝিয়ে বলে, এটা করা ঠিক নয়! আর তখুনি সাবির দুঃখ হয় আরো বেশী। বিহারীকে ও তেমন ভাবে আপনার করে পেতে চায়।

মানিকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই, ভামির নজরে পডলো মানি, আর তখুনি ভামি বললো ইদিকে যে আমি ডাক্যা ডাক্যা হায়রাণ—কুথায়, গেইছিলি শুনি কুথায় যাস্ ?

মানি একবার তাকালো সাবির দিকে।

সাবি বললো, যাবেক আবার কুথা-খুড়শাসের যেমন কথা। যাবেক কুথা ?

—ঘরে ত ছিল নাই।

—গেইছিল রাধা মুদির দকান-খৈল আছে কিনা দেখতে! কি লো ঠাকুরঝি বল্।

—হাঁ বললো মানি।

সাবি বলল, খুড়শশুর বলেছে—ইবারে মাড়ের সাথে খৈল্ দিতে। জান খুড়শাস্ ?

ভামির মনটা প্রসন্ন হলো। সে বললো, সে হৈল্যে ত ভালই হয়।

ওর কথায় সাবি আর মানির মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

(৬)

থাকে থাকে আর কোথায় চলে যায় মুরুলি। গ্রামে কখন আসে আর কখন যে যায়। সে খবর কেউ রাখে না, রাখার প্রয়োজনও মনে করে না। এখন শুনা থাকলেও বাউরী পাড়ায় ওর পড়ে-যাওয়া ঘরটার উঠানে গ্যাড়া নোক্‌লা এসে সন্ধ্যা হলে বসে। যে যা পারে চিৎকার চেঁচামেচি করে, হয়ত বেসুরে গানও জুড়ে দেয়, কিন্তু আসর জমে না। একটু করেই কেমন যেন বিতৃষ্ণা আসে, ওরা উঠে যায়। পোড়া ঘরটার উঠানটা এমনি পড়ে থাকে। কোথাও ঠাই না-পেয়ে পাড়ার কয়েকটা কুকুর এসে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। আবর্জনা জমে, মুরুলি আবার ফিরে এসে আবর্জনা পরিষ্কার করে। সন্ধ্যা হলে আবার একতারা আর ঢোলের আওয়াজে পাড়াটা মুখরিত করে তুলে; তখন সব বুঝে, মুরুলি এসেছে—এই পর্য্যন্ত। মুরুলির অবর্তমানে, ওর অভাবটা অনুভব করবার মত এখন সময়ের বড়ো অভাব ওদের।

ওর অভাবটা মাঝে মাঝে অনুভব করে সুভাষ ঠাকুর। ওর দোকানের খদ্দের বাসের যাত্রী। বাস আবার নির্দিষ্ট সময়ে আসে, নির্দিষ্ট সময়ে চলে যায়। এখন একটা বাস বেড়েছে আরো কিছু সাময়িক খদ্দেরও বেড়েছে। কিন্তু বড়ো মানিক—মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। সারা দুপুরে বাস নেই—আর নেই সকালটায়। সেই সময়টা বড়ো একলা মনে হয়—আর এখুনি সুভাষ ঠাকুরের মনে পড়ে মুরুলিকে।

বেশ কিছু দিনের পর সেদিন মুরুলিকে ওর দোকানের চালাটার কাছে হাতে এক তারা আর কোলের উপর একটা ফিতেয়, অটেকানো ডুগি নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

—কি ঠাকুর চিনতে লারছ নাকি। জিগ্যেস্ করলো মুরুলি। সুভাষ ঠাকুর বললো, চিনব কি ক'রে বল্, একেবারে যে নূতন ভেক্ ধরেছিস্। ঘাড তক্ চুলল ত রাখেছিস্ দেখছি। বলি বাউল হলি নাকি ? বললো সুভাষ ঠাকুর।

—ঠিক্ বলেছ মাইরি—

আমি লোতুন বাউল হঁয়্যাছি।
লোতুন মানুষের প্রেমে, লোতুন মজেছি—
লোতুন বাউল হঁয়্যাছি ॥

দাও ঠাকুর টুক্‌চা চা। গলা-ট ভিজাই লি।

সুভাষ ঠাকুর উনোনের পাশেই বসে কয়েকটা সিদ্ধ আলুর খোসা তুলছিল। আর মাত্র কয়েকটা বাকী আছে। এই ক'টা করে নিয়েই ও বিকেলের জন্য কিছু তেলে ভাজা। আলুর চপ্ করে রাখবে। ওর নিজেরও একবার চা খাবার অবসর এটা। হাতটা ধুতে ধুতে বললো, গিয়েছিলি কোথায় ?

মুরুলি ততখানে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে পড়েছে। সে বললো, এখন কি আর অবসর আছে ঠাকুর। ওর কথায় হাসি পেলো সুভাষ ঠাকুরের।

—তোর আবার কি কাজ আছে রে ? কণ্ঠি বদল করলি নাকি।

—দূর। নিশ্বাস লেবার সময় নাই ঠাকুর। মাইরি বলছি—। কেট্‌লি চাপাও !

মুরুলির চোখে সবই নূতন রূপে দেখা দিচ্ছে আজ কাল। জন্মাবধি এই পঁত্রিশটা বছর যে চেহারা দেখেছে, আজকার রূপের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পায় না মুরুলি। গ্রামের বাইরের চেহারা বদলেছে যেমন, বৃক্ষ অনুর্বর মাটি কেটে ক্ষোভ হয়েছে, আবার বারো মাস যাতে ফলন হয়, তার জন্য কোথাও পাহাড়ের

নীচে হয়েছে বাঁধ, কোথাও নদী-নালা গুলো বাধিয়ে দিয়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে বর্ষার জল। আবার এই জল যাতে জমিতে যায়, তার জন্য দীর্ঘ নালা, যাকে বলে ক্যানেল,—তাই করা হয়েছে। এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে যে পরিবর্তনটা সকলের নজর আর মনকে টেনে নেয়—সেটা হলো যাদের এক ছটারও জমি ছিল না, তারা জমি পেয়েছে, চাষী হয়েছে! প্রকৃতিটাই বদ্‌লে গেছে ওদের। ভূষণ খুড়া আর খুড়ীর গায়ে হাত তুলে না; সারাটা দিন শুয়ে থেকে আকাশের পানে তাকিয়ে ভগবানকে ডাকে না!

সুভাষ ঠাকুর কেট্‌লি ধুয়ে দু জনের মত জল চড়ালো। সবাই ত জমি পেলো, তা তুই কিছু পেয়েছিস?

সুভাষ ঠাকুরের কথা শুনে হাসি পেলো মুরুলির।

হাসির কথা তার না আছে পরিবার, না কিছু। একটা পেট, যার ঘরে গিয়ে দাঁড়াবে সেই খেতে দিবে। দেয়ও। তবে, গাঁয়ের বাউরী পাড়ার মানুষ-গুলোকে যখন দেখে কাজের মধ্যে দিনটা কাটাতে, তখন তারও ইচ্ছা হয়, ওদের সঙ্গে কাজ করে মাটি কাটে, ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়, গোপনে গোপনে মাষ্টারের কাছে প্রকাশ করেছিল মনের ইচ্ছাটা। মাষ্টার বিদ্বত মানুষ, না বিবেচক মানুষ। বিবেচনা ক'রেই বলেছিল, তোর কাজ ত আরো বেশী রে মুরুলি। খুব কঠিন কাজ। তাই করবি।

কি সেই কঠিন কাজ—প্রশ্ন করতে হয়নি, মাষ্টার নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছিল, তুই হলি গায়ক, তুই গানে গানে গরীব মানুষগুলির কথা বলে বেড়াবি। এদের জমি পাওয়ার কথা, এদের লড়াই-এর কথা—এদের আনন্দের কথা, কেমন?

সুভাষ ঠাকুরের চা হয়ে গিয়েছে। একটা ছোট্ট গ্লাসে মুরুলিকে চা-টা এগিয়ে দিয়ে বললো, চা খেয়ে আবার যাবি নাকি-না থাকবি?

—বলল্‌ম ত ঠাকুর এখন শ্বাস লেবার সময় নাই।

—যাবি কুথায়?

—তার কি ঠিক্ ঠিকানা আছে। শুনছি ভূষণ খুড়ারা সার বীজ আনতে গেইছে। যাই।

—তুই গিয়ে কি করবি? তোর কি কাজ?

চা-টা খাওয়া হয়ে গেলে, সুভাষ ঠাকুর বালতি থেকে একটুখানি জল ঢেলে দিতেই মুরুলি গেলাসটা ধুয়ে রাখতে রাখতে বললো, এই লাও মাইরি, তুমার কথা তুমিই পাস্তরে গেইছ দাও এক-ট বিড়ি।

সুভাষ বললো, এখন বিড়ির দাম বেড়েছে রে।

—তুমি না হয় এক-টান টান্যাই দাও। লাও ধরাও।

বিড়ি একটা বাণ্ডিল থেকে বের ক'রে নিজে কয়েক টান টেনে মুরুলির হাতে ফেলে দিয়ে বললো, কি বলেছি মনে ত পড়ে না। বল্ দেখি, কি বলেছি।

সেই এক-ট গপ্-প বৈল্যেছিলে নাই, রাম রাবণে যুদ্ধ হৈল, আর তার গায়েন বাঁধলেক্,—কি ঠাকুর ?

—বাল্মিকী।

—হঁ। বড়ো খটো সটো নাম মাইরি, নাম-ট মনেই থাকে না। তা তুই ঠাকুরের একটো সজা নাম নাই ?

—থাকবে না কেন ?

—কি ?

—রত্নাকর।

—রতনকর। সজা নামই বটে। রাম-রাবণের যুদ্ধের গায়েন করেছিল সীতাকে চুরি কৈর্য়ে লিয়ে গেইছিল রাবণ। ইধানেও যুদ্ধ লাগ্যাছে হে—রামের দল সীতাকে লিয়ে আস্যাছে। শুন তবে।

মুরুলি ওর এক তারায় আঙুল দিল—টুং-টুং, কোলের উপরে ডুগিটায় কয়েকটা গুপ্-গুপ্ শব্দ করে তারের সুরের সঙ্গে গলার সুরটা মিলিয়ে নিয়ে গান ধরলো—

পান (প্রাণ) আমার হরিবোল
বাউরীরা সব নেশাতে পাগোল
হে বাউরীরা।

এ নেশা তুমার ওই মদের নেশা লয় হে, জমির নেশা.

পান (প্রাণ) আমার পিয়ারী—
কেনারামের গেল জোতদারি—
ওগো কেনারামের
পান আমার ভালবাসা
ভূষণ খুড়া হঁয়্যাছে চাষা
হে ভূষণ খুড়া—

ওর গান শুনে হেসে উঠলো সুভাষ। খাসা গান বেঁধেছিস মুরুলি। আরো গায়েন আছে। শুনাব,—একদিন আজ উঠি ঠাকুর!

(চ)

সেদিন আর সন্ধ্যায় কোথাও বেরোয় না মুরুলি। চারি দিকটা ঘুরে, সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হয় আপনার ঘরটিতে। একবার পড়ে যাওয়া চালটার দিকে তাকায়—বিহারী বলেছে—এবারে ধান উঠলে ছাদন করে দিবে। এখন আর ঘরের উঠানটা মাগুলে ভরে থাকে না, ভূষণের মেয়ে মানি দুবেলা ব্যাট দিয়ে যায়। আজো দিয়ে গেছে। বেশ চক্-চক্ করছে উঠানটা। তার উপর চাদের আলো এসে পড়েছে। কি মনোরম মূর্তিই না ধরেছে ওর ছোট্ট অঙ্গনটা। একটা গান মনে পড়ে গেল মুরুলির। গানটার সবটা মনে নেই এক কাল মনে আছে, ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো—, এই আলো যেমন স্নিগ্ধ, তেমন মন ভোলানো তার রূপ! সুখ যেমন আনে, বেদনাও আনে তেমনি। হাঁ বেদনা, আজ হঠাৎ একটা হাসি-হাসি মুখ ওই চাঁদের আলোর রূপের মধ্যে বড়ো উজ্জ্বল ভাবেই দেখা দেয়, এ যেন সেই বীজটা, যা কখন এসে, পড়ে মাটির উপর, কখন সেই পড়ে থাকা বীজটার গায়ে মাটির আবরণ পড়ে ওকে হারিয়ে দেয়, তারপর একটা বর্ষার জল পেয়ে শক্ত মাটির আবরণকে ভেদ করে সেই বীজ অংকুরিত হয়ে উঠে তেমনি ভাবেই, ঠিক তেমনি ভাবে, একটা সুন্দর মুখ তার হৃদয়ের গভীরতা থেকে উঠে আসে! ঠিক কোথায় এই মুখখানি দেখেছিল, তাই স্মরণ করবার চেষ্টা করে মুরুলি। এক সময় তা স্মরণেও আসে; ভাদাসপুরে একটা গানের আসরেই হবে বোধ হয়। হাঁ তাই। মনে পড়েছে। ভাদু পূজার রাত। মেয়েরা সেজে-গুজে এসে গান গাইছিল—তাদের সঙ্গেই ছিল মেয়েটি। সব রূপটা তার মনে নেই, তবে ওর ডাগর চোখের চাউনি আর একটুখানি হাসি, এখনো মনে আছে মুরুলির। যতই ভাবে ততই যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে, ওর চেহারা, পরিবেশ মেয়েরা ধরেছিল গান গাইতে হবে। গেয়েছিল মুরুলি, মনের কথা গানের কথায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর জিগ্যেস্ করেছিল,—কেমন লাগলো?

ওই মেয়েটি একটুখানি হেসে বলেছিল, ভালো।

সেই হাসি টুকু, সেই চাউনি টুকু ওর অজান্তেই ওর মনে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ তাই অনেক দিন পর মনে পড়লো মুরুলির।

—ও মুরুলি দাদা।

—কে? চমকে উঠলো মুরুলি, মানি? আয়।

—মুরুলির কাছে এগিয়ে এলো মানি।

—তুই আট্ দিয়ে দিয়েছিস ?

—হঁ। কাল গোবর দিয়ে দিব।

—তাই দিস্।

—আমাকে তুমার গান শিখাই দিতে হবেক। দিবে ত ?

—বেশ দিব।

মানি বসল মুরুলির পাখাটিতে। কিন্তু বসার কি সুযোগ আছে, সব সময় ভামির চোখে চোখেই থাকতে হয়। চোখে আড়াল হয়েছে কি কৈফিয়ৎ দাও। এত শাসন কেন রে বাপু! সে-কি বাহিরে যাবে না ? ভামি বলে, যাবেক নাই ক্যানে কাজে যাবেক। এখন কি কাজ কম।

—কি গান শিখবি বল! মুরুলি মানির পিঠে আলগা ভাবে হাত দিয়ে জিগ্যেস্ করলো।

সেদিন একটা গান গেয়েছিল মুরুলি। গ্যাড়া নিয়েছিল ঢোল। ঝুমুর গান। গানটা শুনে হেসে পুটিয়ে পড়েছিল বিহারী বৌ-সাবি। ভামির মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছিল, শুন খুড়শাস ভাসুরের গায়েন শুন!

গানটা মনে আছে মানির—, মুরুলি গাইছিল—

ও পাকা ডিঙালা রে
ডিঙালার ভিতর কর্মা
গেল বৌ-এর ডবল চেহারা॥

ভামি নিজের ঘর, থেকেই জিগ্যেস্ করেছিল, কার বৌ যে মুরুলি ?

মুরুলিকে বলতে হয়নি. উত্তরটা দিয়েছিল গ্যাড়া—কেনারামের বৌ গো খুড়ি. কেনারামের বৌ

এ কথা শুনে আরো এক ধমক দেসেছিল সাবি।

—এখন গান গাইবে নাই মুরুলি দাদা ? ছোট বালিকাটির আবদার নিয়ে জিগ্যেস্ করলো মানি।

—শুনবি ? নিয়ে যায় এক তারা ট। উই দেখ।

মানি দেওয়ালের উপর পেরেকে ঝোলানো এক তারাটা এনে মুরুলির হাতে দিল।

মুরুলি গানটা গাইবার আগে বলে দিল মাষ্টর কি বলেয়ে তাকে। মাষ্টার বলেছে—এবারে নাকি আইন হয়েছে ভাগচাষী উচ্ছেদ করা চলবে না। ভাগ-

চাষীর নাম রেকর্ড করা থাকবে সরকারের কাছে, কেনারাম বা শোলু রায় যে চাষের সময় ভাগীদারকে ছাড়িয়ে দিবে, তা আর হবার উপায় থাকবে না। এই নিয়েই গান বেঁধেছে মুরুলি। তাই গাইতে শুরু করলো—

ও দিন বদলে গেইছে,
যতন সব পল্লীবাসী
বাউরীরাও হঁয়্যাছে চাষী,
(তাই) ভামি খুড়ীর মুখে হাসি—
দেখা দিয়েছে।
ও দিন-বদলে গেইছে॥
আবার শুন, মাষ্টর বলে, -
কেউ ভাগচাষী হৈলে
থাকবেক নাম সরকারের ঘরে
তার আইন হঁয়্যাছে।
ওদিন বদলে গেইছে।

শিখলি ?

মানি মনে মনে গাইছিল গানটা মুরুলির পরে পরে, কিন্তু সুরটা মনে থাকলেও গানের কথাগুলো খাপছাড়া ভাবে মনে আছে তার।

মানি বললো। একবারে কি শিখা যায় ? আরেকবার গাও।

এমনি সময়েই ডাক এলো মানির। ওর মা ডাকছে, ওরা সব ঘরে ফিরে এসেছে।

পাড়াটা এবার জমে উঠবে—হাসি মসক রায়, আলাপ আলোচনায় আর সারা-দিনের হিসেব-নিকেষে।

মানি উঠে পড়তেই মুরুলিও বললো, চল আমিও যাই।

এতক্ষণ ভামি আর সাবি কি একটা কথা নিয়ে হাসা-হাসি করছিল। বিহারী আর ভূষণকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সাবি মাথায় আচলটা তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভামি গিয়ে দাওয়া থেকে খাটিয়াটা এনে পেতে দিলো উঠানে।

—এত হাসি কিসের ? জিগ্যেস্ করলো বিহারী।

—তুমাদের ঘরে হাসবার জো নাই নাকি ? হাসতে হাসতেই বললো সাবি।

বিহারী বললো, না বলছিলাম, হাসবার কারণ-ট কি ?

হাত-পা ধুয়ে এসে বললো বিহারী।

আজকাল সব বিষয়েরই কারণ জানতে চাওয়া যেন একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিহারীর। চুপ করে বসে থাকবে—তারও কারণ, কথা বলবে—তারও কারণ, সে যে আজকাল খেতে পারে না। যা খায় তাই বমি হয়ে যায়—তারও কারণ জানতে হবে। বিহারী বলে, কারণ ছাড়া কিছু হবার উপায় নাই বুঝেছিস ?

—চা খাবে না ভাত ? জিগ্যেস্ করলো সাবি।

—টক্‌চা চা কর। আমি বিরাব।

—ফিরবে কখন ? আমি কিন্তুক জাগ্যা রইতে লারব।

বিহারী কোনো জবাব দিলো না, প্রশ্নও করলো না।

বুঝে বিহারী, ও সাবি-বৌএর কথার অর্থ বুঝে। ও যেমন করে পেতে চায় বিহারীকে তেমন করে পায়না। এর জন্য সাবি-বৌএর মনে ক্ষোভ। কিন্তু এটা কেন বুঝে না, যে সাবিকে আরো কাছে, আরো নিবিড় করে পাবার জন্যই ত তার এই বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের ব্যথা সইতে হবে বৈকী। এ ব্যথা যত তীব্রই হোক—এটার স্থায়িত্ব ত চিরস্থায়ী নয়,—এ বেদনা একদিন যাবেই, —যাতে যায় তারই জন্য বিহারীরে বাইরে বাইরে থাকতে হয়।

আজ কৃষি-দপ্তরে গিয়েছিল পাঁচটা গ্রামের যারা জমি পেয়েছে, তারা। সেখানের রিপোর্টটা রাখতে হবে সমিতির অফিসে। পাঁচ গ্রামেরই দু-চার জন করে আসবে। সবারই সঙ্গে আলোচনা করে এরপর কি করবে, তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয়ত সময় লাগবে, আবার নাও লাগতে পারে!

বিহারী বললো, সমিতির অফিসেই থাকব, বাইরে যাব নাই।

এ কথার আর কোনো জবাব দিলো না সাবি। একটা গেলাস ভালো করে মেজে নিয়ে জলটা আচলে মুছে। তাতে চা-টা ঢেলে দিল সাবি।

—রাগ করলি ? আস্তে আস্তে জিগ্যেস্ করলো বিহারী।

—রাগ কৈরলেই বা সে রাগ লিবেক কে।

চা-টা বাড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো সাবি। বিহারী সাবির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

ওদিকে ভূষণের জন্য খাটিয়া বিছিয়ে দিলে কি হবে, তার কি আর বসার সময় আছে। যতক্ষণ কৃষি-দপ্তরে ধর্ণা দিয়েছে। ততক্ষণই তার মনে হয়েছে রামা-লখনার কথা। ঘরে পা দিয়েই সে গোয়াল ঘর দিকে যেতে যেতে বললো। বলদ দুটোকে চরাতে নিয়ে গেইছিল ?

ভামি ভূষণকে দেখেই ভাতটা চডাচ্ছিল। ভূষণের প্রশ্নের উত্তরে ভামি বললো, কুথায় নিয়ে যাবেক ?

ভামির পাল্‌টা প্রশ্নটা আর যাই হোক সন্তুষ্ট করতে পারলো না ভূষণকে। এটা ঠিক চৈত্র-বৈশাখের দাব-দাহে মাটির রস শুষে নিয়েছে, কিন্তু এই গ্রাম-অঞ্চলে এমন জায়গাও না-থাকা ত নয়, যেখানে ঘাস আছে। তাছাড়া ও নিজের চোখেই দেখে এসেছে একটা জায়গা, ঘাসে ঘাসে সবুজ হয়ে আছে—পা রাখলে, পা ডুবে যায়। যাবার সময় বলেও গিয়েছিল মানিকে যেন সেখানেই নিয়ে যায়। তা বুঝতে পারছে—সেখানে যায় নি। মেজাজটা এমনিতেই গরম ছিল, সারাটা রোদ মাথায় গেছে, অথচ ফল হয়নি কিছুই।

—ক্যানে যাবার সময় বৈল্যে যাই নাই ? মানি কৈ ?

—নিয়ে যাবেক নাই ক্যানে ? মানি ! ও মানি !

মানি কখন এসে বসেছে গোয়াল ঘরের পিছনে। তা কেউই দেখতে পায়নি। ও আর মকুলি এক সঙ্গেই বেরিয়েছিল। মুকুলি রাধা মুদির দোকানে বিড়ি খেতে ঢুকেছে। আর মানি কুলি রাস্তার দিকের ছোট্ট পাঁচীলটা টপকে ভিতরে এসেছে। বাপকে আড়াল থেকে দেখেই গোয়াল ঘরের পিছনের গলি অংশটায় পড়ে-থাকা জঞ্জালগুলো কুড়াতে লেগেছে। বাপের হাঁক-ডাক শুনে সেখান থেকে এক মুঠো খড-কুটো হাতে নিয়ে সামনে এসে উপস্থিত হল।

—কি বৈলছ ? মাকে জিগ্যেস্ করলো মানি।

ভামি বললো, লাও সব শুন বিটির মুখে। তবে বকবে। ভূষণ আর শুনতে যায় না কিছুই। সে জানে অজুহাৎ একটা না একটা বেরুবেই। তাই বললো, শুনব আবার কি ? বিহারীর চা-খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, এবার তার বেরুবার কথা। হয়ত মানুষগুলি এখন এসে পড়েছে। মনুও থাকবে সেখানে। তবু একটু থেমে কি হয়েছে—সেটা জেনে যাওয়াই ভালো, এই ভেবে বললো, খুড়া শুনেই লাও।

বল ত মানি কি হঁয়্যাছে।

—বল্‌লো মানি, বল বাপ্‌কে। বিহারীও আছে, শুনুক।

মানি যা বললো, তা হলো এই :

বলদ-জোড়া নিয়ে মানি বাপের কথা মতই সেই গাঁয়ের বাইরে নয়নঝুলিতে নিয়ে গিয়েছিল। রামা-লখনা নয়নঝুলির জলের ধারে ভিজে মাটির উপর এক রাশ কচি কচি ঘাস দেখে ছুটে গিয়েই নেমেছিল। অত ঘাস—মনের সুখে জীবট

বের করে যখন টেনে টেনে ছিড়ছিল, ঠিক সেই সময়েই কেনারামের নোতুন লগদীটা এসে বলেছিল, ওখান থেকে বলদ উঠিয়ে নিয়ে যেতে। বাবুর মানা আছে ওখানে গোরু চরবে না। আর যদি উঠে না যায় তবে গোরুগুলোকে ছাড়ে দিয়ে আসবে। একা মানুষ মানি, সে আর কি করবে? ছাড়েই যদি দেয় তবে আবার হয়ত আরো বেশী শাস্তি ভোগ করতে হবে—এই ভেবে সেখান থেকে আনন্দপুরের ডাঙায় নিয়ে গিয়েছিল ওদের। তার সাক্ষীও আছে।

মেয়ের মুখে সমস্ত বৃতান্ত শুনে ভূষণ বিহারীব মনোযোগ আকর্ষণ করে বললো, শুনলি বিহারী। কথা শুনলি?

গর্জে উঠলো ভূষণ।

এমন গুরু গম্ভীর গলা এই প্রথম শুনলো ঘরের মানুষগুলি। ভামির মত তিরিক্ষি মেজাজের মেয়েও ভয় পেয়ে সিটকে গেল।

বিহারী বললো, রায়-বাঁদ উয়াদের। কিন্তু নয়নঝুলি ত সরকারের। উঠ্যানে গোরু চরাবার হক্ সবারই।

ভামি বললো, বল্‌গা যা সে-কথা।

বিহারী শান্ত ভাবেই বললো, বলা-বলির কি আছে। উয়াদের গোরু চরবেক আর আমাদের চরবেক নাই?

—হঁ চরবেক। আমিই নিয়ে যাব। শালা যত সৈয়ে যাচ্ছি ততই পায়্যা বৈস্তেছে। আমি বলে দিছি বিহারী, এক-ট এসপার উস্‌পার হঁয়্যা যাক্। শালা সব জায়গায় পিছনে লাগা—টাকা দিয়ে সার-বীজ কিনব, তাও না?

বৈশাখ শেষ হতে চলেছে। আর দুটো দিন পরেই জ্যৈষ্ঠ আসবে। মাঝে মাঝে আকাশের রূপ বদলাতেও শুরু করেছে। কোন্ দিন হুড়মুড় করে বর্ষা নামবে। বৈশাখের একবার বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছে। সেই বৃষ্টিতে মাটি তেমন না ভিজলেও, হাল দিয়েছে একবার। গোবরের যা দর—ষোলো টাকা কুড়ি টাকা গাড়ী, সে কিনবার সামর্থ্য নেই। মাঠে মাঠে পড়ে-থাকা গোবর কুড়িয়ে তাই ছড়িয়ে দিয়েছে যদিও, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু। এতে কি ধান হয়, তারপর বীজ-ধান। এই সব সরকার থেকে দেওয়া হবে, সমিতি তাই বলেছিল। কথাটা অবশ্য ঠিক্। তাই গিয়েছিল ভূষণ। সাথে বিহারীও ছিল। এই নিয়ে পাঁচ দিন ঘুরে আসছে ওরা শুধু হাতে।

প্রথম দিনটায় ত তাকিয়েই দেখিনি বাবুরা। দাঁড়িয়ে ছিল ত দাঁড়িয়েই ছিল। বেলা যখন পড়ো-পড়ো তখন ভূষণ বলেছিল, আমরা কি দাঁড়াই থাকব বাবু?

ভিতর থেকে বাবুটি উত্তর দিয়েছিল। তোদের খুশি।

—সার-বীজ কিনব।

—কাল আসিস।

—পাঁচ মাইল দূর থেকে আসছি বাবু।

—আজ আর হবেনা, আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপর দিনত গিয়েছিল, সে-দিনও সেই কথা। তারপরের দিন ভিতর থেকে একটা লোক এসে ভূষণকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, হ্যাঁরে, সার-বীজ লিবি। তা অমন করে রোদে পুড়ে মরছিস কেন! কথাটা অবাক্ হবার মত। দাঁড়িয়ে থাকবার ত আর কোনো ছাদন নেই, তা রোদে দাঁড়াবে না ত কোথায় দাঁড়াবে?

—কত চাই তোর? চা-পানটা বাবুদের পাওনা, বুঝলি। দে, আর কাল সকাল সকাল এসে নিয়ে যাস্। ভূষণ সমিতির উল্লেখ ক'রে জবাবও দিয়েছিল একটা। সমিতি বলেছে-পসয়া যেন কাউকে না দেয়। এক হাতে দাম দিবে এক হাতে জিনিস্ নিবে। চা-পান খেতে দেবার কথা বলেনি সমিতি। কাজেই সে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল-চা পান খেতে দিবেনা। অত তাদের পয়সা নেই।

আজো গিয়েছিল। আজো খালি হাতেই ফিরে এসেছে। বলেছিল, মাল এসেছিল, ফুরিয়ে গেছে।

ভীড়ের মধ্যে থেকেই কে এক জন প্রশ্ন করেছিল, কে নিয়েছে শুনাও হে।

একটা গুঞ্জন উঠেছিল প্রত্যাশী মানুষগুলির মধ্যে ক্রমে তা বাড়তে বাড়তে একেবারে ভিতরে বসে থাকা বাবুটির কানে গিয়ে পৌছেছিল, এবং ভিতর থেকেই উত্তর এসেছিল, যাদের বেশী চাষ তাদের ত আগে দিতে হবে। তার মানে কথাটা এই দাঁড়ায় যে-যাদের কম চাষ তারা সার-বীজ পাবেনা। কিন্তু সরকার কি সেই বলেছে? মাস্টার বলেছে। সরকার যা-বলে ঠিক তার উল্টো করে এরা। কথাটা যে-সঠিক তা এরা গত বছরও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জেনেছে। সরকার বলেছিল কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, সবাইকে উপবাসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা, কোনো অক্ষম মানুষ যদি দু ঘণ্টাও কাজ করে তাকে পুরো বেতন আর পুরো গম দিতে হবে। এই বিত্তিও বাবু আর তার লোকরাই বললো, সরকার বল্লেই হবে কি—আইন নেই। পুরো কাজ করলে পুরো বেতন।

এই নিয়েই আবার ছোটা-দৌড়া, আলাপ আলোচনা, মিছিল-মিটিং—শেষে কিন্তু দিতে হয়েছিল পুরোটাই।

আজ বিহারীও গিয়েছিল। নিজের কানে শুনে এসেছে সব। সমিতিকে বলবে ত।

কিন্তু ভূষণ নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। সে সকলের সামনে ওই বাবুদের জানিয়ে দিয়ে এসেছে, মফৎ যখন তারা সার-বীজ নেবেনা, তখন তাদেরও দিতে হবে। এও বলে এসেছে কাল তারা আসবে—এবং সার-বীজ নিয়ে তবে যাবে।

(ছ)

শোলু রায়ের চালটা এবারেও মার খেয়ে যাওয়ায় কেনারাম বেশ সন্তুষ্ট নয়। বুদ্ধিটা দিয়েছিল সেই। বলেছিল জমি পেলেই চাষ হয় না। চাষ করতে হলে চাই বীজ-সার। অনেক হেঙ্গাম। কাজই সরকার থেকে যে বীজ-সার দেবে, তা যাতে ওদের ঘরে না-উঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা যা-করার তা সে-হ করবে। কৃষি দপ্তর বল আর মহকুমা শাসকের দপ্তর বল—সব জায়গায় তার জানা-পরিচয় অতস্কর ব্যবস্থা করতে বেগ পেতে হবে না তবে হ্যাঁ, কিছু খরচ করতে হবে। সরকারি দপ্তর—মন্ত্রীই না-হয় পাল্টেছে। দপ্তর ত আর পাল্টায়নি কেনারাম বাজী হয়ে গিয়েছিল। সোজা উপারে না হোক্ বাঁকা উপায়ে কাজ হাঁসিল করতে হবে।

কিন্তু পয়সা খরচ করেও যখন ফল লাভ হয়নি, তখন শোলু রায়ের উপরও খানিকটা অসন্তুষ্ট হয়েছিল কেনারাম। একটা আঁচ পেয়েছে শোলু রায়। সে একটুও নিয়মিত কেনারামের ঘরে আসে। বলে রামকানাই দাদার খরচটা না পেলে মনটা কেমন করে। শান্তি পায়না তাই আসা।

রামকানাই-এর অবস্থাটা আরো খারাপের দিকেই গিয়েছে। দীর্ঘ দিন শুয়ে থাকার ফলে সারা শরীরে যা হয়েছে। কেনারামকে জিগ্যেস্ করলে বলে এখন যে-কটা দিন থাকেন। শোলু রায় গিয়ে একবার দাঁড়ায়। কথা বলবার ক্ষমতাটা আগেই হারিয়েছে রামকানাই। তারপর ঘায়ের যন্ত্রণা। কেউ কাছে দাঁড়ালেই চোখ দিয়ে গড় গড় করে জল পড়ে। শোলু রায়কে দেখলে কেঁদে ফেলে রামকানাই, তখন শোলু রায় আবার সান্ত্বনা দেয়। কাঁদছ কেন ভালো হয়ে যাবে। এই সান্ত্বনা বাসায় আরো বেদনা জাগায় রামকানাই-এর অন্তরে।

সেদিনও শোলুরায় রামকানাইকে দেখে এসে বসলো কেনারামের কাছে।

কেনারাম কোনো কথা বললো না। শোলু রায় বললো। অনেক ত করলে। আমি বলছিলাম একবার শচী বাবুকে ডেকে এনে দেখালে কেমন হয়!

শচীনন্দন হেমিওপ্যাথি ডাক্তার। থানার রাস্তার ধারে একট ডিস্‌পেনসারি খুলে বসেছে। বাইরে একটা আলকাতরা মাখানো টিনের উপর লেখা আছে—গ্রেট্‌ হোমিও হল। ডাঃ শচীনন্দন মণ্ডল, এম, বি, (এইচ) সাইকেল করে আসে সকাল বিকেল। রোগীর তেমন ভীড় থাকে না। বিকেলের দিকে যে-দু দুচারটা আসে – চার আনা করে নিয়ে গোটা কয়েক পুড়িয়া দিয়ে দেয়।

কেনারাম বললো, কোনো ডাক্তারই সারাতে পারবেনা। তবে ওটাই বা বাদ থাকে কেন, যখন বলছেন তখন এসে দেখে যাবে।

শোলু রায় পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালো। কয়েকটা টান টেনে বললো, কাজের কাজ কিছু নেই। এই যে-এত বড়ো এলাকা না-আছে একটা হাঁসপাতাল না একটা ভালো ডাক্তার। আরে মানুষের ভালো করতে চাস্‌ এগুলো কর। তা নয়, যারা দু মুঠো খেয়ে বেঁচেছিল তাদের জমি কেড়ে নেওয়া। এটা কি কাজ হলো।

কেনারাম কোনো মন্তব্য করলো না প্রথমটায় সে ঠিক করেছে এখন থেকে যা-করার সে নিজের বুদ্ধিতেই করবে, তবু কাবোর্ড চর্চাতে চায় না যার কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায়, তা নিবে ত। বললো, এবার ত অন্য পথ দেখতে হবে কাকা।

এ যেন দাবার চাল। ভেবে চিন্তে একটা কঠিন চাল দিয়েছ ত অমনি বড়া বসিয়ে মাৎ ত সারলোই আবার মন্ত্র তা টাকেও ধরে বসলো। তবু চাল দিতে হবে। সেটা ভেবেও রেখেছেন, তবে ঠিক চাটের সময়টায়। এখন নয়। তবে হ্যাঁ এখনই কয়েকটার নাম দিয়ে একটা ডাইরী করে রাখা ভালো। তাই বললো, ভেবে রেখেছি, ঠিক সময়ে বলবো ভাইপো। ওদিকে ত আবার সতীশ কেটে পড়তে চাইছে।

কথাটা কেনারামও শুনেছে। সতীশ বাকি তার ব্যবসাই উঠিয়ে নিতে চায়। এখন আর ধার কেউ নিবেনা—এটাই বুঝেছে সতীশ। তাছাড়া ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিভাননীও চায়না—এমন ভাবে পরের জমি-জমা বন্ধক রেখে বা মহাজনি কারবারে তার স্বামী জড়িয়ে থাক্‌। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে কোন মতে যদি বা একটা সন্তান এসেছিল, নিভাননীর গর্ভে তা-ও আসেনি। এবং তার অভিমত হলো—পাপের সংসারে কি সংসার বাড়ে। তাই একদিন চিঠি

লিখে তার ভাইকে আনিয়ে ছিল নিভাননী। নিভননীর ভাইকে দেখিয়ে সতীশকে বলেছিল, এ-যা-বলে তাই কর।

নিভাননীর ভাই ব্রজনাথ,—গ্রামেই থাকে। এক সময়ে একজন ঠিকাদারের মুটির কাজ করত। এখন বসে আছে। সেই ব্রজনাথই বলেছিল টাকা কাজে লাগান জামাই বাবু।

—কি কাজে লাগাবে, তাই বলে দে। বলেছিল নিভাননী।

—কাজের কি অভাব দিদি। এই ত—এখানে একটা হাস্কিং মেসিন লাগালেই হয়। ডিজেলে চলবে। কারো খোসামুদিও নেই, আর ভাবনাও নেই। গাড়িতে করে ধান আনবে মেসিনে চাল করে দেওয়া। মন প্রতি একটা ধার্য ক'রে নিলেই হলো। বসে বসে পয়সা। দেখবে যারা জমি পেয়েছে তারাও আসবে—কেনারামও আসবে।

কথাটা মনে ধরেছিল নিভাননীর। সে বলেছিল, তুই থেকে ব্যবস্থা করে দিয়ে যা।

ব্রজনাথ বলেছিল, থা৷ৃবার ত অবসর নেই, একটা ঠিকা ধরেছি, তা জামাই বাবুর যখন কাজ তখন নিজের ক্ষতি করেও থাকতে হবে।

—দেখা-শোনাও তোকে করতে হবে, কে আর করবে বল্।

—আরে আগে জামাই বাবু মনস্থির করবেন তবে ত। দিন কয়েক এই যুক্তিটা নিয়ে ভেবেছিল সতীশ, তারপর ঠিকই করেছে-- হাস্কিং মেসিনই বসবে। তবে এখানে নয়—বসাতে হলে বসাবে থানায়। জায়গাটা দিনের দিন জমে উঠেছে। বি, ডি, ও অফিস ত ছিলই। এখন আবার আরো দু চারটা সরকারি অফিস হয়েছে। কৃষি লোনের অফিস, এগ্রিক্যালচার একস্টেনসেন অফিস, ব্যাংকও একটা হয়েছে।

এ-সব পরিকল্পনার কথা মুখ ফুটে না বললেও, তা জানা-জানি হয়ে পড়েছে। জেনেছে প্রায় সবাই।

কেনারাম বললো, থেকেও কোনো লাভ হতনা।

—তা যা বলেচ। টাকা ত একটাও খরচ করত না, অথচ এ-সব কাজে টাকারই খরচ।

টাকা অনেক কটাই খরচ হয়ে গেছে কেনারামের। কিন্তু ফল হয়নি। দারোগা বাবু বলেছেন, এখন ত এমন কোনো আইন নেই যে ধরে এনে রেখে দিব। আমাদের হাত বাঁধা কেনারাম বাবু উপরে চেষ্টা করুন।

সেই কথাই বললো কেনারাম।

—ঠিকই বলেছে দারোগা সাহেব, তাই ত বলছিলাম—একটু বেশীই খরচ হবে। এবার ভাবছি ডি, এম-এর কাছেই যাবো। আর ব্যবস্থাও করেছি।

জান ভাইপো, বড় বড় অফিসাররা ত শুধু অফিসই করেনা হে, দিনের বেলায় হয়ত এজলাস করলো, সন্ধ্যায় আর তাদের দেখতে পাবেনা। মেম সাহেবকে নিয়ে যাবে ক্লাবে। সেখানে আছে সব ব্যবস্থা—নাচ গান পানীয়। এর খরচটা আবার সব বহিস ব্যক্তিরাই দিয়ে থাকে। এক দিনের খরচটা দিতে পারলেই—বুঝেছ?

কেনারামের মুখ দেখে ঠিক বোঝা গেল না। ঠিক চলেছে কিনা। এই সময়েই ভিতর ঘর থেকে একটা খবর এলো, তাকে এখুনি একবার ভিতরে যেতে হবে।

—আমি তবে আজ উঠি ভাইপো।

শোলু রায় উঠে গেলো। আজ যার জমলোনা। আলাপ আলোচনায় তেমনি আগ্রহ দেখালেনা শোলু রায়। কেমন যেন একটা অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করলো।

কেনারামের অন্যমনস্কতার একটা কারণ আছে। সেটা বিঁদিকে নিয়ে।

ইদানীং বিঁদি একটা গ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছে কেনারামের জীবনে। বিঁদির উপর হুকুম ছিল—সে যেন কোনো দিন ঘরের মধ্যে না আসে। যা দেবার, যা করবার কেনারাম করবে। করেও দিয়েছিল। কোঠা বাড়ী আর বাউরীদের আছে কার? সেই কোঠা বাড়ী করে দিয়েছিল। শুধু কি বাড়ী? ছোট-খাটো আসবাব-পত্রও—খাটিয়া। লেপ তোষক, লণ্ঠন, শাড়ী, ব্লাউজ কোনো কিছুরই অভাব রাখেনি কেনারাম।

বিঁদি তার যৌবনের দিনগুলোয় এই সমস্ত সামগ্রী পেয়ে গর্বও অনুভব করেছে। বাউরী পাড়ার মেয়েদের মাঝে মিলের শাড়ী ব্লাউজ পরে, মুখে পান দোক্তা নিয়ে মুখ রাঙিয়ে গিয়েছে, বসেছে গল্প করেছে। কেউ কেউ আবার ওকে ডাকিয়েও বসিয়েছে। এখন আর সে দিনগুলো নেই। মেয়েরা ওকে দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আগে ওর ঘরে কারো যাবার আদেশ ছিল না কেনারামের, তাই কেউ যায়নি। যায়নি বলা ঠিক নয় কেনারামের মনোরঞ্জন করবার জন্য—তার অর্থ। দুটো পয়সা পাবার জন্য কখনো কখনো কাকেও নিয়ে এসেছে বিঁদি, কিন্তু যে এসেছে সে বাস করতে আসেনি। এই ছিল সান্ত্বনা। এখন আর সে দিন

নেই। বিঁদি বেশ বুঝতে পারছে। দিনগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেনারাম আর তেমন দেয় না। যাওয়া আসাও কমিয়ে দিয়েছে, মাসে-দশে যদি একটা দিন আসে, তবে আবার তখুনি চলে যায়। বেশ লক্ষ্য করেছে বিঁদি—কেমন যেন একটা আতংক।

বাউরীপাড়ার মানুষগুলোর মধ্যেও একটা গুঞ্জন উঠেছে বিঁদিকে নিয়ে। সৎ-ভাবে বেঁচে থাকতে চায় ত পাড়ায় থাকবে, আর যদি তা না পারে তবে উঠে যেতে হবে এ পাড়া থেকে।

গতর খাটিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল বিঁদি। যে বছর সেও কাজের বদলে খাবার পাবার জন্য গিয়েছিল. কাজ দিতে কার্পণ্য করেনি বিহারী, কিন্তু ওই কেনারামের জন্যই খাটতে পারেনি।

তার চিন্তা এখন সে খাবে কি, বাঁচবে কি করে? ব্যাটা-পবন নেই যে খাওয়াবে, স্বামী নেই যে দেখবে, তাহলে কি সবারই চোখের সামনে ধুকে ধুকে মরবে! এই চিন্তাটাই অস্থির করে তুলেছে বিঁদিকে। নিজের শরীরটার দিকে তাকাতেও আজ তার ঘৃণা করে। তারপর কেনা রায়ের অই অবহেলা।

তাই সেদিন কেনারামের পূর্ব নির্দেশ অমান্য করেই, এসেছিল কেনারামের ঘরে। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি নেমেছে। অকেন দিনের একটা কালো রঙের চাদরে দেহটা ঢেকে সদর রাস্তা দিয়েই বাড়ীতে ঢুকে।

অন্ধকারে কালো চাদরে ঢাকা একটা সচল মূর্তিকে একেবারে রান্না ঘরের দরজার সামনে হাজির হতে দেখে, চমকে উঠেছে রামকানাই-এর বিবাহিতা স্ত্রী বিমলা। বিমলা তখন তার কোলের ছেলেটাকে কোলে বসিয়ে বুকের দুধ দিচ্ছিল। বিঁদিকে দেখেই জিগ্যেস্ করেছে, কে?

বিঁদি গায়ের চাদরটা খুলে দিয়ে বলেছে, আমি গো, আমি।

বিঁদিকে চিনে বিমলা। ওরই জন্যে ওই রাস্তা দিয়ে সে পুকুর ঘাটে যাওয়া বন্ধ করেছে। ওরই জন্য সে পাড়ার কারো বাড়ীও যায় না। তার স্বামীকে তার কাছ থেকে রাতের বেলায় উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

বিমলা বলেছে, তা এখানে কেন এসেছিস?

—আর কুথা যাব? বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলেছে বিঁদি।

—তা আমি কি জানি? এখান থেকে উঠে যা। উঠে যা বলছি। রাগে দুঃখে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠে বিমলার। কোলের ছেলেটার গায়ে আচলটা টেনে ঢাকা দিয়ে দেয়।

—না গেলে লগদী ডাকবে! তাই ডাক গো। তাই ডাক। এক-ট ব্যবস্থা না কৈর‍্যা ত যাব নাই। বলেছে বিঁদি।

এই মেয়েটার সামনে বসে থাকতেও ঘৃণা হয়েছে বিমলার। তার স্বামীর এই জীবন্ত কলঙ্ককে কোনো মতেই সহ্য করতে পারছেনা বিমলা। তারপর এখুনি যদি কেউ আসে। কেউ যদি ওই বিঁদিকে দেখে তারই সামনে বসে গল্প করতে। তাহলে সে-ই বা কি ভাববে। একটু চুপ করেই থেকেছে বিমলা। একটা অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায়। মাথাটাও যেন ঘুরছে। সে যেন বসে থাকার অবস্থাটাও হারাচ্ছে।

কোলের ছেলেটাকে কাঁধের উপর ফেলে উঠে দাঁড়ায় বিমলা।

— এক-ট ব্যবস্থা কিছু কৈর‍্যে দাও, চলে যাব। বলে বিঁদি।

— যাকে বলবার তাকে বল্‌গা। বলে ছেলেটাকে নিয়ে উঠে গেলো বিমলা।

—তাকেই ত বৈলতে আস্যাছি!

সেদিন ছিল না কেনারাম, তাই সেদিন ফিরে এসেছে বিঁদি, কিন্তু বিমলা সব কথাই তাকে বলেছে, এবং এখন বলেছে এ বাড়ীতে আর সে থাকবে না।

সেই সব কথাই ভাবছিল কেনারাম বিঁদিকে নিয়ে কি করা যায়—তারই একটা উপায় উদ্ভাবন করতে চাইছিলেন, এমনি সময়েই এসেছিল শোলু রায়।

ভিতর থেকে ডাক আসতেই বুঝেছিল, আবার বোধ হয় বিঁদি এ বাড়ীতে এসেছে, এবং তারই জন্য ডাক্ পড়েছে কেনারামের।

না, বিঁদির ব্যবস্থা একটা করে দিতেই হবে। এবং এমন ব্যবস্থা করে দিতে হবে—যাতে সব দিক সামলানো যায়। কেনারাম শুনেছে, বিঁদি বলেছে, যতদিন না ব্যবস্থা একটা কিছু হয় ততদিন সে আসবে। দরকার হলে আরো কোথাও যাবে।

(জ)

জ্যৈষ্ঠ শেষ হতে চলেছে। মেঘের আনা-গোনা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে দুটো দিন বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। যেন জানান দিয়ে গেছে এবার তৈরী হও, বুক বাঁধো, শক্ত করে কোমর বাঁধো।

সরকার থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—চাষের সময় যেন গণ্ডগোল না হয়, তার ব্যবস্থা নিতে। জমি নিয়ে কোনো গণ্ডগোল দেখা দেয়, তাহলে

কি করতে হবে আরও স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। বর্গাদারদের বিষয়েও কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা নূতন জমি পেয়েছে তারা যাতে নিজেদের জমি নির্বিঘ্নে চাষ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সক্রিয় সাহায্যের আবেদন এলে সাহায্য করবে সরকার। যে-সব বর্গাদার এখনো নাম রেকর্ড করায়নি, তারা অবিলম্বে যেন নাম রেকর্ড করায়—একথাও বলেছে। সরকার কিন্তু নির্দেশ থাকলেই যে সর্বক্ষেত্রে তা পালিত হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চয়তা তখনই স্থিরিকৃত হবে, যখন গরীব মানুষগুলির তরফ থেকে থাকবে নিশ্চয়তা প্রতিষ্টা করার শক্তি।

এই কথাগুলিই একদিন বাথানে সভা করে সবাইকে জানিয়ে দেয় ব্যোমকেশ।

সেই সভায় ব্যোমকেশ মাষ্টার বার বার করে সাবধান করে দিয়েছে যেন কোনো সত্তেই কেউ প্রলোভনের রাস্তায় পা না-দেয় এবং কোনো রকম বিশৃংখলার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। সেই সভাতেই স্থির হয়—যারা ক্ষেত মজুরি করবে তাদের সরকার নির্দিষ্ট বেতনই দিতে হবে। বিভেদের বীজ যাতে আমাদের সংগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতে না-পারে সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে।

ব্যোমকেশ মাষ্টারের সব কথাগুলোই মনে ধরার মত বর্গাদার, জন-মজুর সবাই যেন এক। পরস্পরের স্বার্থ-পরস্পরকে দেখতে হবে।

সভার বিবরণ সবই পেয়েছে কেনারাম শোলু রায়। শোলু রায় বলেছে, এবার ত নিজেদেরই হালের বোঁটা ধরতে হয়। দিনে দিনে এ কি হচ্ছে। তাই বুঝতে পারেনা শোলু রায়।

কেনারাম নিজের পাঁচটা হাল নামাত এক সময়, এখন সেটা কমে দুটোয় এসেছে। এও বোধহয় রাখা যাবে না। এ ছাড়া বর্গার অনেক বিঘা জমিই আছে কেনারামের। বর্গা চাষের অবস্থা কি হবে। নিজের হালের জমি চাষ করতে গেলেও জন-মজুরি আছে। এই সব বিষয়ে চিন্তিত সে। এক দিন বর্গা চাষীদের সঙ্গে কথাও বলেছে। জানতে চেয়েছে কি তারা করবে।

ইটুড়ির দুলাল বলে দিয়েছে, সবাই যা-করবে তাই তাকেও করতে হবে।

বর্গাদাররা জমি থেকে যাতে উচ্ছেদ হতে না-পারে তারই জন্য বর্গাদার হিসাবে নাম রেকর্ড করাবার একটা হুজুক পড়ে গেছে। ওই মনুচ্ছোঁড়া বিহারী বাউরী আরো কয়েকটা ছেলে ছোকরারা সকাল-বিকেল-সন্ধ্যায় বর্গাদারদের নিে

বসছে, বোঝাচ্ছি, বুঝছে মানুষগুলি। নাম-রেকর্ড করালে আর জমি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া যাবেক, তারা ব্যাংক থেকে ঋণ পাবে, সার-বীজ পাবে, আর সব থেকে যেটা লাভ সেটা হলো, তার পরিবারকে দু মুঠো ভাতের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে না।

শোলু রায় বলেছে, বর্গাদার রেকর্ড করানো মানেই হচ্ছে জমিটা হাতছাডা হয়ে যাওয়া। বিয়ে আছে, শ্রাদ্ধ আছে, পূজো-পার্বন দায়-দায়িত্ব পালন করবার জন্য আর জমি বিক্রী করা চলবেনা। কেউ কিনবেনা জমি! তাহলে বরর্গা-রেকর্ড করাবি দুলাল?

—তা - নিজের ভাল আর কেনা দেখে বলুন!

দুলালের জবাবেই বুঝেছে কেনারাম। ঠেকানো যাবেনা, তবু চেষ্টা করতে হবে। শোলু রায়ের ঘরেই এক দিন যায় কেনারাম, শোলু রায় কেনারামকে দেখে খুশিই হয়। শোলু বলে। চা খাও, আর একটু পায়েস। কেনারাম আপত্তি করে। সে ত খাবার জন্যে আসেনি, হয়ত এরপরে উপোসই দিয়ে থাকতে হবে--যাতে খাবারটা থাকে তার জন্য কি করা যায় তারই পরামর্শ দরকার। শোলুরায় বলে, তুমি ত আসেকইনা-, আপত্তি কর না। দাও গো একটু চা আর পায়েস। কাল সত্যনারায়ণের পূজো করিয়েছিলাম—একটু প্রসাদও দিও গো। এবার বল!

বলার কিছু নাই-সবই জানে শোলু রার, তবু আরো একবার সবটাই বলে সে।

—এখন কি করা যায়?

শোলু রায় বলে, আরে আমি কি বসে আছি নাকি?

শোলু বুঝিয়ে দেয়-এই ব্যবস্থার সব ভদ্র লোকই চটে গেছে! অতএব ভাবনা নেই কাগজেও সব প্রতিবাদ উঠেছে কংগ্রেসের থেকে। দরকার হলে, এখানে একটা সভাই করা যাবে।

শোলু রায়ের স্ত্রী একটা বেকারীতে একটুখানি পায়েস আর এক কাপ চা দিয়ে গেলো, তারই সাথে কয়েকটা শুকনো ফুলের পাপড়ি।

কেনারাম পাপড়িগুলি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে নামিয়ে দিলো। তারপর চা আর পায়েসটা খেয়ে উঠে পড়লো। যাবার সময় বলে গেলো, যাই হোক, উঠে পড়ে লাগতে হয়। —হবে হবে—আমরা অনেককে পাবো ভাইপো। সত্যি কথাই বলি বাবা, একসময় মনে হয়েছিল, এ গ্রাম থেকে চলে যাই। বাধা দিয়েছিল তোমার

কাকীমা। তা না যেয়ে ভালোই করেছি। সারটা জীবনই ত গাঁয়েই থাকলাম পাঁচজনকে নিয়ে। গাঁয়ের কি ছিল-তোমার দেখেছ-, না;ছিল রাস্তা না ছিল খাবার জলের ব্যবস্থা। সব করলাম, আর আজ এই দুর্দিনে এদের বা ছেড়েই যাই কি করে? করতে হবে—এবার একটা কিছু করতে হবে।

কথা বলতে বলতেই ওরা এগিয়ে এলো দরজা পর্য্যন্ত তারপর শেষ বারের মত শোলু বললো, তুমি যাও। ভাবনার কিছু নেই।

সন্ধ্যার দিকে একবার কয়েকজনের কাছে যায় শোলু রায়। কে কি ভাবছে জানা দরকার; কয়েক জনের সঙ্গে দেখাও করে। এবং বুঝিয়ে দেয় যা আইন হয়েছে, একবার বর্গা হলে আর কি জমির ধান ঘরে আসবে তার উপায় নেই। অতএব এখুনি কিছু দরকার। দু চার জন অবশ্য অন্য কথাও বলেছে। বলেছে, শোলু রায় যা-বলে তা ঠিক নয়, জমি জমির মালিকেরই থাকবে, বিক্রী করতে পারবে, বরং ফসল বেশী ফলবে। তারপর একটা জমিতে যদি সারা বছরই ফসল ফলে তবে যা পেত—তার থেকে অনেক বেশীই পাবে।

দিন কয়েক এটা নিয়ে একটু হৈ চৈ করে শোলু রায়, কিন্তু বেশ জমে উঠেনা। শেষে শোলু রায় গাঁয়ের মানুষগুলির সঙ্গে একটা বিশেষণ বসিয়ে বলে। যেদিন সব জমি হারিয়ে ওই কারখানার খালাসী হবে নয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, সেইদিন বুঝবে।

শোলু রায়ের স্ত্রী মানে মমতার মা বলে, অত বুঝিয়ে কাজ কি তোমার?

শোলুরায় বলে, না বুঝলে আমাকেও যে-হাতে বাটি নিতে হবে।

মমতার মা বলে, তাই যদি কপালে আছে, ত তাই হবে। ঠেকাতে পারবে কি? এই যে-জমিটা নিয়ে বিলি করে দিল। পারলে কি ঠেকাতে? আমি বলি ঘরে-বাইরে যত শত্রু বাড়িওলা। বলা ত যায় না কখন কি হয়!

কথাটা অবশ্য ঠিকই বলে মমতার মা। গাঁ যেমন গরম তাতে কখন কি হয় বলা মুস্কিল, তার উপর কেনারাম ত শুনি খাওয়া বাঘের মত হয়ে আছে। বিশ্বাস-নেই ওকে-কখন কি করে বসে।

যাবার আগে মমতার মা আবার মনে বলে যায়—মেয়ে একটা ছিল তার ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছে, তার দয়া ভাবতে যখন হবেনা, তখন এই দুটো বুড়ো-বুড়ীর দুবেলা দু মুঠো খাবার জুটে যাবে। কাজ কি ঝামেলা বাধিয়ে।

আবার সেই আগের বছরের মতই সমিতি দাবি করেছে। ক্ষেত মজুরই হোক মজুরনীই হোক দৈনিক আট-টাকা দশ পয়সা করে মজুরি দিতে হবে। এই নিয়ে মিটিং মিছিল আর ওই মনু ছেলেটা রঙের বালতি নিয়ে দেয়ালে দেয়ালে নিয়ে বেড়ায়।

ব্যোমকেশের নিজের হালেই—প্রায় পচাত্তর আশি বিঘা জমি। অতএব এক দিনেও তা শেষ হবে না। মজুর লাগাতেই হবে। বাইরের থেকে যে-মজুর নিয়ে আসবে তারও উপায় নেই। গত বছরই দেখেছে, যারা এসেছিল তারা চলে গিয়েছিল। কিন্তু যখন যা চাইবে তাই দিতে হবে নাকি? কোন্-দিন হয়ত কেনারামের এই খরটাই চেপে বসবে, তখনও কি ঘরটা ওদের ছেড়ে দিবে কেনারাম? যা-বলবে, তাই নত-মস্তকে মেনে নিতে রাজী নয় সে। একটা কিছু করতেই হবে। এবার আর কারো সঙ্গেই আলোচনা করবে না সে। আর পরামর্শ করা মানেই শোলু রায়ের হাতে বন্দী হওয়া অথচ কাজের কাজ একটাও হয় না। শোলুরায়ের কথায় হাজার টাকা দিয়েছিল কেনারাম সাহেবদের ক্লাবে, কিন্তু একটা ইন্‌কোয়ারী করতেও কেউ আসেনি!

সতীশ থানায় একটা জায়গা দেখে এসেছে। ওখানেই হাস্কিং মেসিন বসাবে সে। ইতিমধ্যে ওর সম্বন্ধী ব্রজনাথ নাকি মেসিন কিনতে চলে গেছে, ধান উঠার সময়েই চালু করবে। বাকী যারা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করাই যায়না—তার কারণ তাদের বিশ্বাস করে না কেনারাম।

শোলু রায় ইতিমধ্যে ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা করে বলেছে, দাবিটা কি বেশী হচ্ছেনা ব্যোমকেশ?

ব্যোমকেশ বলেছে, সরকার-ত আর বোকা নয়, হিসেব করেই মজুরি ধার্য্য করে দিয়েছেন। চাল-তেল-কাপড় সবেরই ত দাম বেড়েছে—ওদেরও ত খেয়ে বাঁচতে হবে।

--কিন্তু, হ্যাঁ স্বীকার করি দু চার জন ও টাকা দিতে পারে। কিন্তু সবাই ত পারবে না। সে-ক্ষেত্রে কি হবে?

—আমি কি বলব তার, সমিতি বসবে-বিচার করবে সিদ্ধান্ত নেবে।

—বিচার করলে ত এখুনি করতে হয়, চাষ ত শুরুই হয়ে-গেছে।

এর কোনো জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। শেষে শোলু রায় বলে এসেছে, বলে গেলাম, আমার বিষয়টা বিবেচনা করে দেখিস বাবা!

এর পরেই শোলু রায় নিজেই এসে কেনারামকে বলে গেছে, বুঝলে ভাইপো ওই ব্যোমকেশ ছোড়াকে বলে দিয়ে এসেছি, যা খুশি তাই করবে—তা আর সহ্য করা যায় না।

কেনারাম বলে, সহ্য ত দিব্যি করছ দেখতে পাচ্ছি। এখন কি আর আমাদের মান-ইজ্জৎ আছে ?

শোলু রায় বলে, তাই বটে। কথাটা ঠিকই বলেছ, কিন্তু করবে কি ? সরকার যে ওদের, তাইত এত সাহস।

এ কথায় কেনারাম একবার শুধু তাকায় তার দিকে। এখন শোলু রায়ের কাছেও মুখ খুলেনা কেনারাম।

লোতুন লগদীটা এসে কাছে দাঁড়ায় আর তখনই উঠে যায় কোনারাম। নিশ্চয়ই কোন সংবাদ আছে।

আজ কাল বিঁদিও রাস্তায় রাস্তায় কেনারামের নাম করেই নানা কথা বলে বেড়ায়।

সেবার খেতে দেবার দাবি নিয়ে কেনারামের ঘরে আসায় একটা ফয়সালা করেছিল কেনারাম। বলেছিল, আগে যেমন সে পেতো তাই পাবে, ঘরে আসার দরকার, নেই। ঠিক সময়ে পৌছে যাবে ওর ঘরে। লোতুন লগদীটাই বাইরে বাইরে এক বার কয়েকটা টাকা আর কয়েকসের চাল দিয়ে এসেছিল। সেগুলো ফুরিয়ে যেতেই আরো চেয়ে পাঠিয়েছিল বিঁদি কিন্তু এবার কোনো জবাব না-পেয়ে আবার যখন এসেছিল তখন ত নতুন লগদীটাই বের করে দিয়েছিল বিঁদিকে।

বিঁদি সেই দিন থেকেই রাস্তায় রাস্তায় কেনারামের নাম উল্লেখ করে বলে বেড়ায়, তার সর্বনাশ করেছে ওই কেনারাম। ভদ্রলোক—বড়লোক-পয়সা আছে, তাই একটা বাউরী মেয়ের এমন করে সর্বনাশ করল গো ! ধর্ম্ম কি নাই। হে ধর্ম্ম তুমি দ্যাখো !

ইদানীং সেটা আরো বেড়েছে। সে-স্পষ্টই বলে, আমাকে পথে বসাই নিজে দালান ঘরে থাকবেক-তা হৈত্যে আমি দিব নাই !

সেই কথাটাই বলে লগছি। তখনকার মত কেনারাম লগদীর হাতে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে, আসতে বলে এবং এর পরে একদিন দেখাও করবে কেনারাম। সেটাও জানিয়ে দিতে বলে দেয়।

আরো সাতটা দিন অমনি কাটে। অনেকেই সমিতির সঙ্গে একটা আলোচনা

ক'রে একটা ফয়সালা করে নিয়েছে। হয়নি,—কোনারাম আর শোলু রায়ের। অনেক জমি পড়ে আছে এখনো। এদিকে চাষের মরসুমও শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে রিপোর্ট গিয়েছিল, গ্রামের খুব অরাজক অবস্থা, তাই দারোগা একদিন এসে খবর নিয়ে গেছে অরাজক অবস্থার কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে শোলু রায়দের বুদ্ধিমানের মত কাজ করতে বলে গেছে।

দারোগা সাহেবের উপদেশেই হয়ত শোলু রায় নিজে গিয়ে বলে এসেছে সাড়ে সাত টাকা পর্য্যন্ত তারা দিতে রাজী।

এই শুনে ভামি বলে, সেই যখন মল মখালি তবে ক্যানে লোক হাসালি।

ভামির কথা শুনে হেসে উঠেছে ভূষণের মত মানুষটাও।

—কামিন মুনিষ ত সমান দর রে বিহারী? জিগ্যেস্ করলো ভামি।

—হঁ খুড়ী, বললো বিহারী।

ভামি এদিক-সেদিক ঘুরতে ফিরতে একবার দাড়ায় গোয়ালের দরজায়, একবার সাবির কাছে। আবার তখুনি সেখান থেকে এসে নিজের দাওয়াটায় এসে বসে। দাওয়ার এক পাশে গাদা করে রাখা ঘাসের বোঝা। বিহারীর চালাটায় রাখা আছে কয়েক বোঝা আফর (চারা)। আজ দুটো দিন নিজেদের জমিতে কাদা করে জল বাধিয়ে রেখে এসেছে। কাল থেকে রোয়ার কাজ।

ভামি বললো, আগে ত সব নিজের জমিতে রুইবেক?

—তা ত রুইবেক। অনেকের এ রুয়া হঁয়্যাই গেইছে খুড়ি।

—তোর কাকারই এখনো হয় নাই।

—হঁয়্যা যাবেক।

—আর বিড়ি মুড়ি দিবেক ত খুড়শাশ? নিজের ঘরের দাওয়া থেকেই জিগ্যেস্ করলো সাবি।

ভামি একটু হেসে বিহারীকে বললো, কি রে বিহারী দিবেক?

বিহারী কি একটা জবাব দিতে যায়, কিন্তু জবাবটা দেবার আগেই একটা ঘটনা ঘটে। অতি তুচ্ছ, তবু যেন এর গুরুত্ব অনেকখানি। বিঁদি দরজা থেকেই চিৎকার করতে করতে ঘরের ভিতরে এলো। সামনা সামনি বিহারীকে দেখে একেবারে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, তবু কাছকে আস্যাছি। বিচার কর—বিচার কর। ভূষণ দাদা—তুমিও আছ, তুমিই বিচার কর।

কি হয়ে গেছে বিঁদি! আগের সে-রূপ নেই। রূপের জৌলুষ নেই। চুলে যে কতকাল তেল পড়েনি, তা চুলের রুক্ষতার দিকে চোখ পড়লেই বুঝা যায়।

পরণের শাড়িটার অনেক জায়গা ছিঁড়ে গেছে। কোথাও গিঁট দিয়ে ছ্যাঁড়া অংশটি ঢাকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। কোথাও হাঁ করে আছে। হাওয়ায় উড়ছে রুক্ষ চুল, আর ময়লা ছ্যাঁড়া শাড়ীর অংশ। বিঁদিকে এই অবস্থায় দেখলে রাগ হয় না ক্রোধ হয় না। একটা দুঃখ হয়। মেয়েটার উপর মায়াও হয়।

বিহারী বললো, বৈস্-বৈস্।

—কুথায় বৈসব, বল কুথায় বৈসব? বৈসতে কে দিবেক?

কেমন অসংলগ্ন কথা!

ভামি যেখানে বসেছিল সেখানে বসেই বললো, অমন কৈরছ ক্যানে ঠাকুরঝি?

—জ্বালায় করছি। জ্বালায়। আজ পাঁচটা দিন কিছু খাই নাই। এই গ্যাখ্। দুটি খাত্যে দে! দিবি?

বিহারী বললো, সে না-হয় খাবি, কিন্তুক কি বিচার কৈরতে বলছিলি?

এর বিষয়ে সবই জানে সবাই। একট ত বিঁদি নয়। বিঁদির মত এমন কতো বাউরী মেয়ে-বৌ তাদের দেহ বিক্রী করেছে। বাপ-ভাই দেখেছে, জেনেছে তবু কিন্তু কিছু বলেনি। ও পথ থেকে সরে আসতে বলেনি, বলতে পারেনি। কেন পারেনি তাও জানে বিহারী। পেট ভরাবার এখন ওইটাই ছিল সহজ রাস্তা। এ দোষ ত বিঁদির নয়, এ দোষ সমস্ত সমাজ দেহে জড়িয়ে আছে, আর তার কারণটা ত দারিদ্র্য।

কিন্তু এটা যে দারিদ্র্য দূর করতে পারেনা—সে ত নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছে আজ! তাই বিহারী নূতন করে ভাবতে পারছে। সমাজ থেকে এই দুষ্ট ব্যাধিকে দূর করবার কথা ভাবছে বিহারী।

বিঁদি তার শাড়ীর খুট থেকে পাঁচ টাকার একটা ময়লা নোট বিহারীর পায়ের কাছে রেখে বললো, আমি আর উয়ার টাকা লুব নাই।

ভামি সাবি এসে দাঁড়ায় বিঁদির পাশে। মানিও আসে কিন্তু ভামি তাকে ধমক দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এ-সব কথা না-শোনাই ভালো।

বিহারী বুঝে ব্যাপারটা। হয়ত খাবার চাইতে গিয়েছিল বিঁদি, তাই কেনারাম তাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিয়েছে, কিম্বা বিঁদির মুখটা বন্ধ করবার জন্যই এই ব্যবস্থা। বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রামের সবাই দেখছে। বিঁদি কেনারামের উল্লেখ করে নিজের জীবনের কথাগুলো বলে বেড়ায়। কেউ হাসে, কেউ রাগ করে, কেউ বা বলে, বিঁদির মাথা খারাপ হয়েছে।

—কি হঁয়্যাছে বল! বললো ভূষণ।

—লিতে চাই নাই টাকা, হাতে গুঁজে দিয়ে গেইছে ওই লগদী, বলেছে আরো দিবে যদি—

মাঝ পথে কথাটা থামিয়ে একবার চারিদিকটা দেখে নেয় বিঁদি। তারপর নিজেই বলে, ওর কি, বলি—শুন, যদি ওই আটকুড়ার কথা শুনি।

বলি, কি কথা গো, এতকাল কথা শুনেই ত এই হাল,

তা বল কি কথা?

বলে কিনা—বিহারীর ঘরে—

—বিহারীর ঘরে কি? বল্! জিগ্যেস্ করলো ভূষণ। যারা ছিল ওর চারিপাশে তাদের চোখেও বিস্ময়। মুহূর্তেই সবারই মুখে একটা উৎকণ্ঠার ছাপ। সাবির বুক-টা দপ্-দপ্ করতে শুরু করলো। মনে পড়লো অনেক দিন আগের একটা দিনের একটা ঘটনা!

—বল গো ঠাকুরঝি। চুপ্ কৈরলে ক্যানে, বল! বললো ভামি।

—বলি? বিহারীর মুখের পানে তাকিয়ে যেন অন্তরে গোপনে রাখা কথাটা প্রকাশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলো বিঁদি।

বিহারী শান্ত ভাবেই বললো, না বৈললো আর বিচার হবেক কি কৈর‍্যা?

—হঁ তাই ত বটে! বলেছে যদি তুর ঘরে আমি আগুন দিয়ে দিই তবে আমাকে রাজরাণী কৈর‍্যে দিবেক—হি হি হি হি—কি সাধের কথা শুন! কথাটা এক নিশ্বাসে বলে হাঁপাচ্ছে বিঁদি, যেন অনেকখানা পরিশ্রম করার পর আলগা হওয়া।

সবাই তাকায় বিহারীর দিকে। কিছু বললো না বিহারী, পায়ের নীচের মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

শুনলি ত বিহারী। পুড়াই মারার মতলব।

এ কথার জবাবেও বিহারী মুখ খুললো না। এটার পিছনে যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

—বিচার করবি বিহারী, বললো বিঁদি।

—তুই এই খ্যানেই থাক্ বিঁদি পিসি। বললো বিহারী।

সাবির ভালো লাগে না—ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। দেখলেই ভয় করে, তারপর এই কথা শুনে আরো ভয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে সাবি। কিন্তু বিহারীকেও চেনে সে—যা একবার মুখে বলেছে, তার আর নড়ন-চড়ন হবে না।

এই অবস্থায় ভামির কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললো সাবি, শুন দেখি কথা। ইখ্যানে কুথায় থাকবেক ?

ভামিও তাই ভাবছিল। এখানে কি বাড়তি ঘর আছে নাকি ? আর ওকে ঘরে রেখে আরো একটা বিপদকে ডেকে আনা ! অতএব ভামি বললো, কথা-ট ভাব্যা বল্ বিহারী। খাত্যে বরঞ্চ দিতে পারি—এক-ট মানুষ খাবেক, তা আর কি—তাই বলে—

বিহারী একবার তাকায় ভূষণের দিকে। ভূষণও ভামির কথায় সায় দিয়ে বলে, দিনে ত আর ভাবনা নাই—রাতের ব্যবস্থা একটা করা যাবে কুথাও।

—কুথায় কৈরব্যে ? জিগ্যেস্ করলো ভামি।

—সে ভাববো। বললো ভূষণ।

আরো কয়েকটা দিন পর মুরুলির ঘরটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে দেখা গেলো। বিঁদি নিজেই আঁচলটাকে কোমরে বেঁধে হাতে ঝাঁটা নিয়ে উঠান, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, পড়ে যাওয়া চালটায় হাত দিয়েছে।

এরই মধ্যে একদিন মুরুলি ঘরের ছিরি ছারি দেখে বলে গেছে—ই যে একেবারে ভোল পাল্টাই গেইছে গো ! মিয়া-মান্ষের হাত না লাগলে কি সোন্দর হয় কিছু।

মুরুলির কথা শুনে হেসেছে বিঁদি।

(ঝ)

ঘরে বাস উঠে গেছে ভূষণের। সারাটা দিন পড়েই থাকে ক্ষেতের মাথায়। ধানের গাছগুলি বেড়েছে। সবুজ আর সবুজ। ঢেউ উঠছে. ঢেউ উঠছে। ঢেউ-এর আর শেষ নেই। চোখ জুড়িয়ে যায়। অনেক কালের অনেক পুরুষের ক্ষুধিত অন্তর আনন্দে উত্তেজনায় প্রশান্তিতে ভরে উঠে ! একেই বোধ হয় বলে তৃপ্তি ! অন্তরে তৃপ্তির সমুদ্র আর বাইরে সবুজ-সাগর। ভূষণ স্পষ্ট দেখতে পায় এই সবুজ সাগরের হাসি, একটা ঢেউ আরো একটা ঢেউ-এর কানে কানে বলে যায় কতো কথা—সে যেন শুনতে পায়। হাসি পায় ভূষণের। নিজের মনেই হাসে। ক্ষেতগুলির চারিপাশে ঘুরে ঘুরে দেখে। কখনো আবার অতি সাবধানে—যেমন সাবধানে সদ্য প্রসূত সন্তানকে জননী কোলে তুলে নেয়। তেমনি আগ্রহে আর সতর্কতায় আলগা ভাবে ওদের মুঠির মধ্যে ধরে খানিক পরেই ছেড়ে দেয়, আর

ছাড়া পেয়েই যখন ধানগাছগুলো মাথা তুলিয়ে, গা দুলিয়ে আরো হাজারো গাছের সঙ্গে মিশে যায়.তখন হো হো ক'রে হেসে উঠে ভূষণ।

তেমনি হয়েছে রামা-লখনা। কিছুতেই ছাড়বে না ভূষণকে। ওকে দেখলেই বাঁধন ছিড়তে চাইবে। আরে. এই ত জলে কাদায় এই কয়টা মাস খাটলি। এখনো ভালো ক'রে চলতে পারিস না, তা নয়—যাবেই। কি আর করে, নিয়ে যেতেই হয়। মাঠে ছেড়ে দিয়ে বলে, দেখিস, কারু ক্ষেতে নামিস না। বুঝলি ? যা ওই বনের ধারে। অনেক ঘাস—তা বলে বেশী দূরে যাবি নাই। ডাকলেই আসিস

যে সময়টায় ওরা চরে, সেই সময়টায় দু বোঝা ঘাস কেটে নেয় ভূষণ। তারপর সন্ধ্যা হলে ও কাস্তেটাকে কোমরে গুঁজে, মাথায় ঘাসের ভারী বোঝা নিয়ে গোরুগুলির পিছনে পিছনে আসে।

সেদিনও তাই হয়েছে। গোরুগুলি ঢুকতেই ভামি মেয়েকে বললো, বাঁধ মানি।

ভূষণ ঘাসের বোঝাটা নামিয়ে বললো, আগে জল দেখা। আর উয়াদের খুরে তেল দিয়ে দে। আমি দিয়ে আসি একটা বঝা রাধুকে।

—এই ত আল্যা টুকচা না হয় জিরাই লাও! বললো ভামি।

—ওই ঠ্যানেই জিরাব।

আজকাল রাধুর সঙ্গে উঠা-বসা বেড়েছে ভূষণের। রাধুর সামান্য জমি আছে— সেই জমিটা ভূষণই চাষ করেছে এ বছর। এ ছাড়াও রাধু ভালো ভালো কথা বলে; শুনতে ভালো লাগে ওর। বলে, তোদের নিয়েই ত আমি রে!

—দকান-ট বাড়াও রাধুদাদা!

—ইবারে বাড়াব, তার আগে ভাবছি বিটি-টার বিয়ে দিয়ে দিব। বুঝলি ত ওটা একটা দায়।

রাধুর কথায় ভূষণের মানির কথাটাও মনে পড়ে যায়। মানিও বড়ো হয়েছে। বাউরী ঘরে আট ন' বছরেই বিয়ে দেবার রীতি। ভূষণের বিয়ে হয়েছিল, সেই কখন। মনে পড়ে, কোলে করে নিয়ে গিয়েছিল পিশি। সে পিশি কবে মারা গেছে। তারপর বিয়ের পর আবার ওই পিশির কোলে ও আর কনে ঘরের একজনের কোলে চড়ে এসেছিল মানির মা। যা ঘুরিয়েছিল—মেয়েরা সুর করে গান করেছিল - সে সব কথা ভুলেই গিয়েছিল। আজ আবার অতীতের বিস্মৃত-প্রায় সুখের দিনের ছবিগুলি মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

রাধুর কথার জবাবে বলে, আমারো ত বিটি-ট ডাগর হঁয়্যাছে হে। ইবারে আমাকেও দেখতে হয়।

— দেখবি বইকি। বলে রাধু। তারপর তুজনে তুটো বিড়ি নিয়ে টান দেয়।

ভূষণের কথার জবাবে ভামি বললো, জলদি ফিরবে।

ভূষণ চলে গেলে ভামি মেয়েকে ডেকে বললো, দেখ, কেমন পেট ভর্‌য়্যাছে। আর তুই যখন চরাতে নিয়ে যাস ?

তার মানে মানি গোরু চরাতে নিয়ে গেলেও এমন জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে ঘাস নেই, কিম্বা চরছে কিনা নজর দেয় না।

ভামির কথার উত্তর দিলো সাবি, ঠাকুরঝির আর সময় কুথা খুড়শাশ্ ?

—ক্যানে উ কি কাজ-ট কৈর‍্যা ফাটাই দিছে ! ঘরের ত কুটাটি লাড়ে না আজ-কাল। বললো ভামি।

মানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জবাব দিলো, করি না ?

—কি করিস ? গুয়াল কাড়িস্ ? ঘুঁটা দিস ?

সাবি বললো, গোবর ঘাঁটলে গায়ে গন্ধ উঠবেক যে খুড়শাশ। কি লো ঠাকুরঝি ঠিক বলি নাই ?

সাবির মুখে তুষ্টামির হাসি !

মানি আজ-কাল একটু সেজে-গুজে থাকতে ভালবাসে। খারে কিম্বা সোডায় কেচে ফর্সা করে শাড়ী পরে, পরিপাটি করে মাথা বাঁধে। আয়না নিয়ে বার বার মুখ মুছে—তারপর ঠিক কপালের মাঝখানে সাবির কাছ থেকে একটু সিঁতুর নিয়ে তাই গোল করে এঁকে দেয় একটি টিপ্। সাবি ওকে সাজতে দেখে মুখ টিপে হাসে, আবার কখনো হাল্‌কা একটু ঠাট্টা করে, মানি রাগ করে না। বলে, ভাল লাগে, তাই সাজি। যে দেখতে লারে সে চখে ড্যালার ডোগি লাগাক্। মানির কথায় আরো হেসে উঠে সাবি। আর সে হাসিকে উপেক্ষা করেই মানি বেরিয়ে যায়।

যাবার সময় সাবি বলে দেয় যেন জলদি ফিরে মিছে কথা বলে ওর এই লুকোচুরি ঢাকা দিয়ে রাখতে পারবে না। সাবির শেষ কথাটা কানে যেতেই মানি চোখের ইসারায় তাকে সাবধান করে দেয়—মা শুনতে পাবে।

পানুকে দেখেছে সাবি—এক মাথা ঢেউ খেলানো চুল। মুখখানা মিষ্টি, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন সাজিয়ে সাজিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। গোরু চরাতে যায়— সঙ্গে থাকে একটা বাঁশী। যেমন বাঁশী বাজায়, তেমনি আবার মাটি কাটে, চাষ

করে। ও নাকি বলেছে, মুনিষ মাইন্দারি সে করবে না। আর গোরুও চরাবে না। চাষটা হয়ে গেলেই সে যাবে শহরে। আসানসোলে অনেক কয়লা খাদান, সেখানে শ্রমিক হবে। বেশী মাইনা পাবে, থাকবার ঘর পাবে, আর তখন মানিকে নিয়ে সেখানেই থাকবে সে।

সাবির কথায় ভামি বললো, কি আমার রাজার দুলালি রে, বলি যার ঘরে যাবেক, সে ঘরে, যদি ভাগ্যে থাকে তবে গোবর ঘাটবেক।

মানি বললো, আমি বলেছি—গোবর ঘাটব নাই? তবে সন্ধ্যায় আমি আর পা-ধুতে লারব। আর কুটাটি লাড়ি না ত এত কাজ করে কে?

—কত যে করিস!

—বেশ করি না ত করি না। কথাটা বলেই বেরিয়ে যাবে এমনি সময়ে দরজার আড়াল থেকে ওর শাড়ির আঁচলটা ধরে টান দিলো সাবি।

মানি ঘুরে দাঁড়াতেই সাবি বললো, আজ আর দেখা হবেক নাই ঠাকুরঝি।

—ক্যানে? চুপি চুপি জিগ্যেস্ করলো মানি।

—রোজই তোকে দেখবার তরে কদম তলে দাঁড়াই থাকবেক? আয়। বৈস।

মানির মনটা হা হা করে উঠলো। এই নিয়ে আজ চারটা দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি মানির। কোথায় গেছে—কিছু বলেও যায়নি। তবে কি আসান-সোলেই চলে গেছে নাকি? কান্না পেলো মানির। যদি জানত সাবি ভাজ তবে আগে বলেনি কেন?

—তুই কি করে জানলি ভাজ? জিগ্যেস্ করলো মানি।

সাবি বললো, আবার যে সেই কাজের বদলে খাবার চালু হবেক—তাই সব গেইছে লো।

তা হবে, হবে—তার জন্য পানু যাবে কেন? গত বারে ত কাকেউ যেতে হয়নি, বিহারী এসে সবাইকে বলেছিল। তাই বললো, সে ত বিহারী দাদা যাবেক।

—তুর দাদাই ত নিয়ে যাইছে। বলেছি লো, ঘরে আনতে বলেছি ঠাকুর জামাইকে। বুঝলি! সাবি মানির থুৎনিটা একটু নেড়ে দিলো।

মানির মুখে একটু সলজ্জ হাসি গেলো খেলে। তারপর বললো, আচ্ছা ত!

—সে ভার আমার লো ঠাকুরঝি। সে ভার আমার।

বিঁদি একটা নূতন জীবনের আস্বাদ পেতে শুরু করেছে। যার ঘর, সে ঘরেই থাকে না। তবু সব গুদ-গাদ করে রাখে বিঁদি। ভামির কাছ থেকে গোবর নিয়ে এসে দাওয়ায়, ঘরের ভিতরের যতটুকু অংশ ব্যবহার যোগ্য, তাই গোবর দিয়ে নিকোয়। উঠানে ঝাট দেয়, ঘরের জঞ্জালগুলো ঝুড়িতে নিয়ে গিয়ে সাধারণী ডোবাটায় ফেলে দিয়ে এসে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে স্নান করতে যায়। ফিরে এসে রান্না চড়ায়। এখন একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে বিহারী। এরপর, বলেছে কাজের বদলে খাটালি একটা ক'রে দিবে।

রাঁধতে চাপাতে গেলেই আরো একটা মানুষের কথা মনে আসে, সে হলো, মুরুলি। জানে না, সে আসবে কি না—এলেই বা কখন আসবে, তারও কোনো ঠিক নেই। আবার এলেই খাবে কি না তাও জানে না বিঁদি। তবু দুজনেরই রান্না করে। যদি না আসে, তবে সেইগুলো রেখে দেয়—রাত্রে খায়। মাঝে মাঝে মুরুলির জন্য দুঃখও হয় তার। কি যে মানুষ!

সারাটা দিনই নিজেকে ব্যস্ত রাখে বিঁদি। যখন মনটা খালি হয়ে যায়, যখন আর হাতে কিছু কাজ থাকে না,—তখন পাচালের ফাঁক দিয়ে ভামি নয়ত আরো কারো ঘরে গিয়ে বসে। রাত হলেই গা ছম্ ছম্ করে। মনে হয় কে যেন ওর ঘরের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়। বুক টা দুর-দুর করে উঠে বিঁদির।

এক দিন এ কথা বলেছিল বিহারীকে। বিহারী বলেছিল, ই পাড়ায় কেউ আসবেক নাই। তুই নিশ্চিন্তে থাক্।

তবুও কিন্তু আতংক ঘুচেনা। কেনারামের মতলব ফাঁস করে দিয়েছে বিঁদি। খবরটা এখানেই আটকে থাকেনি। গাঁয়ের মানুষ ত জেনেইছে। আরো জেনেছে থানার দারোগা।

দারোগাকে একদিন সাইকেল করে আসতে দেখেছিল বিঁদি। তবে কেন এসেছিল। কি বলে গেছে কিছু জানেনা বিঁদি। মাঝে মাঝে দুটো করে পুলিশকে বন্দুক নিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় ঘুরতেও দেখেছে অনেকে। বিঁদিও দেখেছে।

সেদিন দুপুরে রান্না করে, অবসর সময়টা এমনি বসে থাকে কেন, তাই একটা সূচ-সুতোর মুরুলির একটা ছেড়ে-যাওয়া জামা নিয়ে বসেছিল বিঁদি। জামাটার পিঠটা ছিঁড়ে গেছে। একটু সেলাই ক'রে দিলেই গোটা হয়ে যায়। এমনি সময়েই রাস্তায় একতারার আওয়াজ, কানে এলো বিঁদির। কেন জানেনা, মনট খুশিতে ভরে উঠলো ওর। উঠবে কি উঠবে না ভাবতেই ভিতরে এলো মুরুলি

বিঁদি উঠে গিয়ে একটা ছ্যাড়া বস্তা এনে পেতে দিল দাওয়ায়।

—আমাকে আবার আসন? বললো মুরুলি।

বিঁদি বললো, ক্যানে তুই কি মানুষ লস? আজ আর বিরাট কাজ নাই। ভাত রাধ্যাছি, খা।

—মুরুলি গায়ের জামাটা খুললো। বড়ো গরম। নেয়ে উঠেছে সে। জামাটা ভিজে গেছে।

বিঁদি ওর ছেড়ে দেওয়া জামাটা উঠানের রোদে মেলে দিয়ে বললো, এই ভাদরের রোদে কুথায় গেইছিলি।

মুরুলি কিছুতেই থাকতে পারে না এক জায়গায়। এ অভ্যেসটা গড়ে উঠেছে সেই শিশুকালে। মনে পড়ে, খুব স্পষ্ট নয়,—তবু মনে আছে যখন ওর মা বেঁচেছিল তখন মায়ের কোলে চড়ে গাঁয়ের এ-বাড়ী সে-বাড়ী যেত, কারো বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াত—দুটি খাবারের জন্য। মুরুলিকে দেখিয়ে ওর মা খাবার চাইত। বাসি হোক্, এঁটো-কুটো যাই হোক। তাও যদি না থাকে তবে এক মুঠি চাল। গাঁয়ের বাইরেও নিয়ে যেত ওর মা। মা-টা মরে যাবার পর, একটা উদোম ছেলে আর কি করে, সারাটা দিন ঘুরে ঘুরেই কাটত, যখন যেখানে যেত সেই খানেই থেকে যেত। না ছিল খাবার ঠিক, না রাতে থাকবার জায়গা! কখনো রাত কাটত কারো চালায়, কখনো গাছের তলে। সেই যে অভ্যেসটা গড়ে উঠেছে, আজও সমানে চলছে কিছুতেই স্থির হয়ে একটা জায়গায় থাকতে পারেনা মুরুলি। তারপর এই কয়েকটা বছর শুধু তাকে টানে বাইরের জগৎ। মাঠ-ঘাট-প্রান্তর যেখানেই যায়, সেইখানেই দেখে নূতনের আবির্ভাব। কেন, বলতে পারবে না—তবে ওর ভালো লাগে। মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে কখনো পাথর ভাংছে, রাস্তা তৈরী করছে। মাটি কাটছে—ক্ষেত করছে, পুকুর কাটছে। আবার নিজেদের প্রয়োজনের কথা, নিজেদের সুখ-দুঃখের কথাও—একই সঙ্গে সবাই বলছে।

মুরুলি পরণের কাপড়টার একটা অংশ নিয়ে মুখের ঘামটা মুছে, সেই অংশটা দিয়ে হাওয়া করতে করতে বললো, এক গেলাস জল দে পিশি।

বিঁদি গেলাসটাকে ধুয়ে মুছে এক গেলাস জল একটা হাত পাখা এনে জলটা মুরুলির হাতে দিয়ে নিজে পাখাটা নিয়ে বাতাস করতে লাগলো।

জলটা খেয়ে গেলাসটাকে নামিয়ে রেখে মুরুলি বললো, বনের পোখরের জল, লয়?

গাঁয়ের মানুষ যে-যে পুকুরে পায়। সেই পুকুর থেকেই জল নিয়ে আসে। এক এক পাড়া যায় এক এক পুকুরে। কষ্ট হয় গ্রীষ্মে, সব পুকুরেই পাঁক ফেটে যায়। তখন বনের পুকুরে ছুটে সবাই। মদ্যিখানের একটু জল নিয়ে কাড়াকাড়ি। রায় বাঁধে এই ভাঙ্গরে নামতে মানা। পোনা ছাড়ে কেনারাম। কে কখন গামছা দিয়ে ছেঁকে নিয়ে যাবে—তারই জন্য চব্বিশ ঘণ্টা লোক মতায়েন করা আছে!

বিঁদি বললো, না রে ভূতাগোঁড়ার জল।

—ইবারে আর জল আনতে যাত্যা হবেক নাই পিশি!

বললো মুরুলি।

ওর কথা শুনে হাসি এলো বিঁদির। বললো, তোর বৌ আনবেক নাকি?

—দূর। গাঁয়ে গাঁয়ে কল্ বসবেক।

—সে আবার কি রে?

মুরুলি দেখে এসেছে থানায়। কাশিহাঁড়, পড়াডিহায় কল বসেছে। একটা হাণ্ডেল জোর করে টিপে ছেড়ে দিলেই হদ্-হদ্ করে জল পড়ে। সেই জল, খাবার জল। যত খুসি নিয়ে যাও। মাটির কোন্ গভীরে—বয়ে যাওয়া জলটাকে খুশি মত মাটির উপরে নিয়ে এসে ব্যবহার করা—এ এক তাজ্জব ব্যাপার! পড়াডিহার কলের জলে মুখ ধুয়েছে মুরুলি। আঁজলা ভরে খেয়েছে—আ—কি মিষ্টি। তৃষ্ণা মিটে যায়।

মুরুলি বুঝিয়ে দেয় বিঁদিকে। বিঁদি সব শুনে বলে। উ গাঁয়ে কখন বসবেক?

—সে-ট জানে ম্যাষ্টররা। আমি ঘুরে আসি পিশি।

—আবার এই রোদে কুথা বিরাবি? হেই লে এক জামা-ট গায়ে দিয়ে যা,—উ-ট থারে কাচে দিব।

মুরুলির ভালোই লাগে বিঁদির এই শাসন। স্নেহ কখনো পায়নি। স্নেহ কি বস্তু তা জানেনা। ভালোবাসা কাকে বলে, তাও জানবার সুযোগ হয়নি তার। কিন্তু বিঁদি যখন তাকে আদেশ-নির্দেশ দেয় তখন ভালো লাগে মুরুলির। মনের ফাঁক, যেটা দীর্ঘকাল ধরে অপূর্ণই ছিল, সেই ফাঁকটা যেন বিঁদির এই টুকরো টুকরো শাসনে ভরতে শুরু করেছে।

—তাই দিস্, বললো মুরুলি।

—বেশী দেরী করিস না। ওই দ্যাখ্ হাঁড়িতে জল রাখ্যা দিয়েছি, আস্যে খাবি।

সেদিনটা আর বেরোয়নি মুরুলি। সন্ধ্যা বেলায় নিজের উঠানেই একতারাটা নিয়ে বসেছে মুরুলি। গ্যাড়া এসেছে—নোকলা এসেছে। আরো কয়েকজন ছেলে ছোকরা। মেয়েদের ত আর এত অবসর নেই, তাই তারা আসেনি। তবে আসবে তাদেরও কেউ কেউ রাত একটু গভীর হলে। মানির হাতে কাজ নেই, সে এসে দেখে গেছে আসরটা। বিঁদি দাওয়ার উপর বসে আছে।

মুরুলি একতারার তারে আঙুল দিলো। গ্যাড়া তার ছোট্ট ঢোলটায় দিলো চাটি।

মুরুলি গাইতে শুরু করলো—

দেখে দেখে নয়ন জুড়ায়।
পাড়াডিহায় ছাখে আইলম
কলের মুখে জল বিরায়॥
বৌ-বিটিরা হাঁড়ী করে,
জল নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
আর খাবার জলের তরে
যাবেক নাই কেউ বাঁদ-গোঁড়ায়।
ই গাঁয়েতেও বসবেক কল,
বিহারী দাদা সত্যি বল,
বন-পোখোরের পাক-ঘাটা জল
খায়্যা ডুগি পেট ব্যাথায়॥

বিহারীর গান শুনে মেয়েরা হেসে উঠে।

ভামি নিজের ঘরের উঠান থেকেই বলে। ঠিক বলেছিস মুরুলি। কিন্তু কখন হবেক রে?

মুরুলি বললো, হবেক গো খুড়া, হবেক। বিহারী দাদা জানে।

পরদিন সত্য সত্যই সংবাদটা নিয়ে আসে বিহারী। ভূষণও ছিল সঙ্গে। দু জনের মুখেই হাসি।

ভামি ওদের দুজনকে হাসতে দেখে বললো, এত হাসির কি হৈল গো।

এ প্রশ্নে আরো হাসি পায় বিহারীর। আবার বিহারীর হাসি দেখে ভূষণও হাসে। এদের দুজনের হাসি সংক্রামিত হয়ে ঘরের মেয়েরাও হাসিতে যোগ দেওয়ায়।

বিহারী উঠানে পেতে রাখা খাটিয়াটার উপর বসে বললো, শুন খুড়ী।

—বল।

বিহারী বললো। এক সময় দু খুড়া ভাইপোতেই এক সঙ্গে উপাস দিয়েছি, মাটি কাট্যাছি চাষও করেছি, ইবারে খুড়া ভাইপো এক সাথেই পাঠশাল যাব।

ভূষণ আরো একবার হেসে উঠলো।

—বুড়া বয়সে আবার লিখা পড়া। ও সাবি পুঁথি-পত্তর ঠিক কৈর্যে রাখিস লো!

সাবি বললো, যারা পড়বেক, তারা কিনে লিবেক।

সমিতি অফিসে কথা হয়েছে, লেখা-পড়া শিখতে হবে সবাইকে। তারা লেখা পড়া জানেনা বলে পদে পদে ঠকে। নিজেদের জানতে হলেও লেখা পড়া জানা দরকার। একজন ছেলে গরীব ঘরে জন্মেছে, সুযোগ পায়না বলেই সে চিরটা কাল শিখিয়ে দেওয়া দুর্ভাগ্যের কথাগুলো আওড়ায়। এখন যদি সে লেখাপড়া শিখে, সে জানবে। না এ অবস্থা দৈব নির্দিষ্ট নয়। এটা সৃষ্টি করা। যারা শোষণ করে, তারা চায়না এরা লেখা-পড়া শিখুক, তারা যা চায় না, আমরা তাই চাই।

ভূষণ বললো, পুঁথি-পত্তর সমিতিই দিবেক। কাকেউ ভাবতে হবেক নাই।

—দেখে দেখে নয়ন জুড়ায়—বিহারী দাদা আছিস নাকি?

দরজা থেকে মুরুলি জিগ্যেস্ করলো।

ভামি বললো, ওই আবার আসছে। আয়রে আয়।

মুরুলি একতারাটায় আঙুল রেখে বাজাতে বাজাতে এলো।

—কুথাকে গেইছিলি? জিগ্যেস্ করলো ভূষণ।

মুরুলি সুর করে গাইলো—দেখে দেখে নয়ন জুড়ায়। বুঝলে খুড়া, যা দেখছি তাই সুন্দর। কি হাসি হে! মাটি যে হাসে এই পথম দেখলম খুড়ী।

—কি দেখলি? জিগ্যেস্ করলো ভামি।

—মুখে বলা যায়না খুড়ী, মুখে বলা যায় না।

মিয়া হাসে মরদ হাসে
হাসে ব্যাটা বিটি
হাসে গাছ হাসে পাতা
হাসে পাহাড়ীর মাটি।

কি থান হঁয়্যাছে মাইরি,—দেখে দেখে নয়ন জুড়ায়।

—আবার শুনেছিস ইবারে তুর খুড়া যে পাঠশাল যাবেক রে।

—মাইরি? হ্যাঁ হে খুড়া?

—হঁ রে। বললো ভূষণ।

…ইবারে ক খ গ'র গান গাইতে হবেক ভাসুরকে। জোরে জোরেই বললো সাবি। সাবির কথাটা কানে এলো মুরুলির। মুরুলি বললো। গাইব-গাইব। কই রে মানি।

মানি এসে দাঁড়ালো মুরুলির পাশে। আস্তে আস্তে বললো, কি বৈলছ?

- লে আমার সঙ্গে গা দেখি।

মুরুলি সুর ধরলো। গাইতে শুরু করলো—

ক-এ কিষাণ হৈল ভূষণ

খ-এ খুড়ীর হাসি বদন

গ-এ গোরুর সেবা করে

বৌ বিটি মায়।

দেখে দেখে নয়ন জুড়ায়॥

একবার দুবার তিনবার। তিনবারের বার মানি গাইলো ওই গান। তারপর এক সাথেই গাইলো মানি আর মুরুলি।

—শুনলি ত খুড়ী।

(৯)

কেনারাম তার ঘরের বাইরের দরজার কাছে একটা টুলে বসে বসে একটা বিড়ি টানছিল। আগে এ বাড়ীতে গড়গড়ার রেওয়াজ ছিল। রামকানাই আসানসোলের বাজার থেকে একটা নক্সা-আঁকা গড়গড়া আনিয়েছিলেন। নলটাও ছিল তেমন সুন্দর। নলটা তুলে মুখে দিয়ে কথা বলতেন বাইরের মানুষদের সঙ্গে। মুনিষ মাইন্দারই হোক, বা ওই বাউরীদের কোনো পুরুষ এলেই বলতেন তামাকটা সেজে আনতে। তারা বাঁ হাতটা ডান হাতের কুনুই-এ রেখে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিত কলকেটা নিতে। কৃতার্থ হয়ে যেত তারা।

সে দিনটা শেষ হয়ে গেছে। নয়ত এত সাহস হয়—।

বাউরীরা মুখের উপর বলে দিতে পারে। এঁটো পাতা তুলবেনা। রামকানাই বড়ো কষ্ট পেয়েই মারা গেল। শেষ সময়টায় পোঁফা হয়ে গিয়েছিল ঘাগুলোয়।

একটা দুর্গন্ধে ভরে থাকত ঘরটা। কেউ যেতনা কাছে। এমনকি কেনারামও যখন যেত, তখন নাকে কাপড় দিয়ে যেত। কেনারাম বার বার মনে মনে কামনা করত-ওর বাপের মৃত্যু। সেই মৃত্যু যখন হলো, তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল কেনারাম!

শোলু রায় বলেছিলেন, উনি ছিলেন পুণ্যবান ব্যক্তি, সময় হয়েছিল চলে গেছেন। দুঃখ নেই। ওঁর মর্যাদা অনুযায়ী শ্রাদ্ধ শান্তি করাও বাবা।

সেই শ্রাদ্ধেই আসেনি বাউরীরা। স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, এঁটো পাতা তুলতে যাবেনা মেয়েরা।

বিড়িটা টানতে টানতে সামনের কয়েকটা বাড়ীর দিকে তাকিয়েছিল কেনারাম। এই ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে বাউরী পাড়ায়। মনের দৃষ্টি দিয়ে সেই বাউরী পাড়াটাকেই দেখছিল কেনারাম। কারো বাড়াতে খড় নেই, কারো ঘরের দরজার কপাট নেই, উঠানের এক দিকে নর্দমায় কয়েটা মুর্গি চরে বেড়াচ্ছে—ক্ষিদের জ্বালায় ধুকছে কেউ, মেয়েদের উদাম গায়ে খড়ি উঠেছে, এই ত ছিল অবস্থা। এবার তারা ঘরে নূতন খড় তুলবে, মেয়েরা মাথায় তেল দিবে, আবার শুনছে—একটা ক্ষেতে বছরে দুটো ফসল তুলবে। ধানের আর দর পাবেনা কেনারাম। দর-দামের কথা ত পরে, এখন ধানগুলে বাঁচিয়ে রাখাই সমস্যা। ঝাঁটি পাহাড়ীর গচের নূতন বাঁধটার থেকে জল নিয়েছিল কেনারাম। একটা প্লটে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি ভাদ্রে একটাও বড়ো জল হয়নি, জল না-পেলে সব শুকিয়ে যাবে, জল যাচ্ছিল বেশ, কিন্তু ভূষণ সেটা বাঁচিয়ে দিয়ে নিজের জমিতে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। এত বড়ো আস্পর্দ্ধা হয়েছে বাউরীদের। সেই ডেকে পাঠিছিল কেনারাম। কিন্তু আসেনি, বলেছে, আমার সময় নাই। লগদী জিগ্যেস্ করেছিল, কখন আসবে সে। একথারও, জবাব দিয়ে ছিল ভূষণ যা শুনলে রক্ত গরম হয়ে যায়!

আবার লগদীকে পাঠিয়েছে কেনারাম। যদি না-আসে, তবে যেন ধরে নিয়ে আসে। এই নির্দেশ দিয়েছে।

সেই ভূষণের জন্যই অপেক্ষা করছে কেনারাম। এবারও যদি না-আসে তার জন্য কি ব্যবস্থা করতে হবে, তারই জন্য শোলু রায়কেও ডাকিয়ে এনেছেন কেনারাম। প্রথমে, শোলু রায় অসুস্থতার অজুহাতে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পাছে আবার সে রামকানাই-এর শ্রাদ্ধের জন্য নিয়ে আসা দ্রব্য-সামগ্রীর পুরো হিসেব চেয়ে বসে এই ভয়! ইতিমধ্যে কথাও উঠেছে জিনিষের দর নিয়ে।

সতীশ বলেছে, হয় ঠকিয়ে নিয়েছে বাজারে, নয় পকেটে গেছে কারো। এই কারো মানেই যে শোলু রায় ছাড়া কেউ নয়—সেটা সবাই বুঝবে।

এই সব চিন্তা করেই শোলু রায় এসেছে। —এমন বাইরে বসে আছ যে! জিগ্যেস-করলো শোলু রায়। কেনারাম বললো, বসুন।

—শরীরটা ক' দিন ধরেই খারাপ। গাঁটে গাঁটে বেদনা, তা তোমার কাকীমা বললো, পরেই না হয় যেও। আমি চল্লাম, তাই কি হয়, নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে কেনারাম। কি হয়েছে বল!

বলতে আর হলো না। লগদীর সঙ্গে ভূষণ এলো। ভূষণকে দেখেই কেনারাম চীৎকার করে বলে উঠলো, কি রে, সাপের পাঁচ পা দেখেছিস্, মনে হচ্ছে?

ভূষণ শান্ত ভাবেই বললো, গরীবের চোখে ত দেখা যায় না। —তোরা দেখছিস্। 'কম্ম কাজ-টা ভালো হচ্ছে না। চোখ দুটো গোল গোল ক'রে বললো কেনারাম। কেনারামের পাশেই চৌকাটার উপর বেশ নিশ্চিন্ত আরামে শোলু রায় একটা সিগারেট টানছিল। এই সময় একবার মুখের ধোঁয়াটা ছেড়ে বেশ শান্ত ধীর ভাবেই বললো, তা অবশ্য ঠিক। কাজটা ভালো করছিস্না।

—রং-তামাসা ঝেড়ে দিব। বুঝলি? ধমক দিয়ে বললো কেনারাম।

ভূষণ এই সবে ভাদরের রোদ মাথায় করে ক্ষেত থেকে ফিরে এসেছে। রোদের মতই তখনো মেজাজটা গরম হয়ে আছে তার। কেনারামের ধমক সেই গরমের জ্বালা বাড়িয়ে দিলো।

ভূষণ-বললো, আস্তে বল বাবু?

কেন তোকে কি আমি ডরাই না তোর খাই

—আমিও তুমাকে ডরাইনা, তুমার খাইনা।

কেনারামের মেজাজ চেনে শোলু রায়। একগুঁয়ে আর মাথাটা নারেট। শোলু রায় না থাকলে সেবার বিহারীর ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছিল আরকি। তেমনি হয়েছে ওর লগদী। সব ব্যবস্থা পাকা, রাত দুপুরে থেকে একটা শুকনো আমড়া আঁটি পুড়িয়ে তাই দূর থেকে তীরে গেঁথে ছুড়ে দিবে বিহারীর বাড়াতে, আগুন যখন জ্বলে উঠবে, তখন ওই বিধি মেয়েটাকে বের করে নিয়ে গিয়ে গুম করে দিবে তার জন্য ভেড়ী থেকে কয়েকটা লোকও এনেছিল সে।

কেনারামের স্ত্রী বিমলা। এ সবের আঁচ পেয়ে নিজেই গিয়েছিল শোলু রায়ের কাছে সেবার শোলু বাঁচিয়েছে ওকে। পরে অবশ্য সংবাদটা কি করে

থানাতেও গিয়েছিল। দারোগা এসেছিল। শোলু নিজের ঘরে দারোগাকে খুশি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

শোলু রায় পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে বললো, একে বাবা মারা গেল, তাব এক বেদনা, তার উপর অতবড়ো শ্রাদ্ধে এই শিস, ধরছে ধানের গাছ। জল না-থকায় মাটি শুকিয়ে গেছে। এখন একটা জল না-পেলে, সারা বছরের স্বপ্ন বাস্তবে আর রূপ ধরবে না। তার জমি তার ধান, এই জমি আর এই ধানকে মরতে দিবে কেন সে। পাহাড়ীর বাঁধ থেকে নিজের খুশি মাফিক কেনারাম জল নিয়ে নিয়েছে তার জমিতে, বাধা ভূষণ দেয়নি। আজ কেনারামের বাধা মানবে কেন? ভূষণরা যাতে জল না পায়। যাতে তারা খাবার না পায়, যাতে তারা আবার ওই কেনারামেই শরনাপন্ন হয়, তারই ষড়যন্ত্র।

ভূষণ বললো, ক্ষেত ভরলেই বাঁধ্যে দিব।

—শুনলেন জবাব শুনলেন কাকা। আমার জমি শুকনো থাকবে?

ভূষণ জবাব দিল, আমার জমিও, জমি।

—আমার নেওয়া হলে, তারপর তোরা নিস।

—আমার পরেই বা তুমি নিলে।

উঠেই যাচ্ছিল ভূষণ, ঠিক সেই সময়ে কেনারাম উঠে দাড়ালো, হাতের পোড়া বিড়িটা ছুড়ে দিয়ে বললো, জলটা কি তোদের?

—তুমারও লয়। সরকারের জল, তুমার সিয়াতের হক যদি থাকে। আমাদেরও তেমনি হক আছে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালোনা ভূষণ। গট্-গট্ করে চলে গেলো।

পরাজয়ের আত্মগ্লানি এই প্রথম অনুভব করলো কেনারাম। রাগে দুঃখে বেদনায় কেনারামের অন্তরটা পুড়তে লাগলো। নিজেকে কিছুতেই সামলে রাখতে পারলো না কেনারাম আর তাই প্রকাশ হয়ে পড়লো তার কথায়। শোলু রায়কে সাক্ষী মেনে বললে', আমিও কেনারাম, দেখি কেমন করে ওরা মাঠের ধান ঘরে নিয়ে যায়।

(৬)

ভাদ্র শেষ হতে চলেছে। আকাশের মেঘ সবুজ। দিনের বেলায় সূর্য্যের যেমন বেড়েছে দাহিকা শক্তি, রাত্রে আবার তেমনি শীতলতার পরশ বুলিয়ে দেয়

রাতের চাঁদ। ভূষণ সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফিরে গোরুগুলির সেবা করে একটা ডাব্ হুকোয় তামাক টানে। এটা নূতন কিনে এনেছে ভূষণ। এক কল্‌কে তামাক অনেকক্ষন আরাম করে টানা যায়! গোরুগুলিকে খাইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে শান্ত করে হুকোটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। এই একটু সময়—তারপর খাবারটা খেয়ে গিয়ে রাতটা কাটায় ক্ষেতের মাথায়। শুকনো তাল পাতা দিয়ে মাচা তৈরী করে রেখেছে। একা ভূষন নয়—সবাই। বলা যায় না—ধান চুরি হতে পারে, কেনারাম তার মহিষগুলি ছেড়ে দিতে পারে। এই সব আপদ-থেকে ধানগুলি বাঁচাতেই এই প্রচেষ্টা। এই প্রথম নিজেদের ক্ষেতের ধান, নিজেদের খামারে নিয়ে আসবে এরা।

ভূষণকে আর বলতে হয় না। ও এসে খাটিয়ায় বসলেই মানি কলকেয় আগুন দিয়ে হুকোটা দিয়ে আসে বাপের হাতে।

ভূষণ হুকোটা টানতে টানতে আগামী দিনগুলোর কথা ভাবে। ঘরটায় ছাদন দরকার; এর বাতা বাঁশ সব ঝরঝরে হয়ে গেছে. একেবারে নূতন কাঠামো করলে ভালো হয়। কিন্তু তার আগে আছে মানির বিয়ে। কয়েকটা পাত্র দেখে রেখেছে ভূষণ। কিন্তু মুখ ফুটে এখনো তাদের নাম কারো কাছেই বলে নি। এমন কি ভামিকেও না। ভামি মেয়ের বিয়ের উল্লেখ করলে বলেছে, হবেক হবেক। খরচ • চাই • সাধটা উঠুক।

মেয়ের বিয়েতে পাত্রকে পণ দেবার রেওয়াজ এদের সমাজে নেই, পাত্র পক্ষকেই বরং দিতে হয়। এখন আবার সেই রেওয়াজ মেনে চলবে কিনা কে জানে। সে-বছর ভাদাসপুরের আকুলার বিটির বিয়েতে, ওকে দিতে হয়েছিল এক শ' টাকা নগদ। জামাই কলিয়ারীতে কাজ করে। প্যাণ্ট পরে, হাতে ঘড়ি নেয়—এমন পাত্রকে ত দিতেই হবে। ভূষণ দেখেনি, তবে শুনেছে, বর পক্ষ পায়ে হেঁটে আসেনি, আর মেয়েরা গান গেয়ে বরকে আনেনি। রিক্‌সায় চড়ে মাইকে হিন্দি গান বাজিয়ে এসেছিল!

ভূষণ ওর মেয়ের বিয়েতে সেই পুরোণো রীতি-নীতিই মেনে চলবে!

একটা মনোরম ছবি ফুটে ওঠে ভূষণের চোখের সামনে! এই উঠানে ছাদনা-তলা হয়েছে, বিহারার ঘরে রান্না-বান্না হচ্ছে, আত্মীয়-কুটুম্বে ভরে গেছে ঘরটা। মেয়েরা গান গাইছে, পুরুষরা এক দিকে বসে তামাক টানছে আর গল্প করছে একটা নূতন জীবনকে আঁকড়ে ধরতে যায় ভূষণ। মাঝে মাঝে সংশয় জাগে—আসবে কি সেই দিন—যেদিন ঘরে বিরাজ করবে আনন্দ আর আনন্দ!

মাষ্টার বলে, আসবে নিশ্চয় আসবে। পৃথিবীতে নাকি এমন দেশও আছে। তবে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে গরীব মানুষদের। গরীব গরীব—এদের মধ্যে জাত নেই। গরীবই জাত।

কথাটা হয়ত ঠিকই বলেছে মাষ্টার। গাঁয়ের এমন অনেক কটা মানুষের নাম বলে দিতে পারে ভূষণ, যারা দিন দুবেলা উপাস দেয়। এই ত গুপী ঘোষ, সম্পর্কে নাকি আত্মীয় হয় কেনারামের। সেও ত খাটতে এসেছিল কাজের বদলে খাবার কাজে। আর ওই সরলা? বামুনদের মেয়ে। বিধবা। ঘরে থাকতে আছে ভাই। তার জমি নাই। এসেছিল মাষ্টারের কাছে, জমি যদি না হয় না হয় একটা সাহায্য—যাতে সে বাঁচতে পারে।

ভাবতে গেলে, বটে বইকি, মাষ্টারের কথাটাই ঠিক।

মানুষের মত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তার জন্যে শুধু চাষ করলেই হবে না। লেখা-পড়া শিখতে হবে। নইলে ওই জমিও রাখতে পারবে না।

তারই কাজ শুরু হয়েছে। পাঠশালা বসে। মুকুলি তার ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে। বিঁদি উঠানটা ঝকঝকে করে রাখে। বই, শ্লেট ওর জিম্মাতেই থাকে। কোনো দিন মনু ঠাকুর আসে, কখনো আসে আবার সুভাষ ঠাকুরের ছেলে নাড়ু।

মানি যায় পড়তে। বাপের কাছে এসে গল্প করে—যা পড়ে এসেছে, তাই বলে। মন দিয়ে শুনে ভূষণ আর মনে মনে হাসে। মাঝে মাঝে জিগোস্ করে, কেন সে যায় না।

ভূষণ বলে, যাব যাব।

ভামি বাপ-বেটির কথা শুনে, কাজ করতে করতেই মন্তব্য করে, সময় যে কত! ঘরে বসবারই সময় নাই, তার পাঠশাল যাবেক।

এই সব কথাই ভাবছিল ভূষণ খাটিয়ায় বসে। হুকোটা ধরাই ছিল হাতে। কোন্ সময় কলকের আগুনটা নিবে গিয়েছিল জানতেও পারে নি। আরেক ছিলিম সাজবে কি না সেই ভাবছিল ভূষণ, ওদিকে ভামি একটা পাকা তালের ছোবড়াটা ছাড়াচ্ছিল। তালটা কুড়িয়ে এনেছে সে। এমনি সময়েই নামো পাড়ার বাদলা এসে হাজির! কখনো আসে না বাদলা। আজ এই ওকে দেখে ভূষণ বললো, কি রে? আয় বৈস।

বাদলার মুখ চোখের চেহারা স্বাভাবিক নয়। হাঁপাচ্ছে সে।

—বৈসতে আসি নাই ভুষণ, এক-ট বিপদ হঁয়্যা গেইছে রে! বিপদের উল্লেখ করতেই, ভামির হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেলো। ওদিকে সাবি—এতক্ষণ শুয়েছিল, উঠে বসলো।

—জল কাটাই নিয়েছে কেনারাম?

—না।

—তবে কি ধান খাওয়াই দিয়েছে?

—না তাও না।

—তবে?

বলতে একটু কিন্তু কিন্তু করছিল বাদলা, বলবে কিনা ভাবছিল। কেন না ও এসেছিল বিহারীকে কথাটা বলতে। বিহারী নেই!

—বিহারী নাই নাকি?

—সমিতির ঘরে হবেক।

—গেইছিলম, নাই।

—কি হঁয়্যাছে বল্ ক্যানে।

বললো বাদল। যা বললো তা এই—

মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিল বাদলা পাঁইসা কুলির শিরোমণির ব্যাটার সঙ্গে। শিরোমণি মহিন্দারি করে কেনারামের ঘরে। সেই শিরোমণি বাদলার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাদলার ঘরে। ওর নাকি চাল-চলন ভাল নয়।

আগে এ রকম ঘটনা অনেক হয়েছে। একটা মেয়ে বেরিয়ে গেছে অন্যের সঙ্গে। মেয়ে পুরুষের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে ত একজন আরেকজনকে ছেড়ে দিয়ে আবার বিয়ে করেছে। আবার এও হয়েছে—বাবুদের যাকে ইচ্ছা ঘর থেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু এখন হবে কেন? হতে দেওয়া উচিত নয়।

—বিটি-ট কাঁদছে, কি করি বল্ ত! জিগ্যেস্ করলো বাদলা।

—তাইত রে—বিহারী থাকলে ভাল হৈত। ম্যাষ্টর, বিহারী, মন্তু ঠাকুর কেউ নাই।

—দেখলাম নাই ত।

বাদলার মেয়েটার বয়স এই মানির বয়সী, দু এক বছরের বড়ই হবে। কেউ কখনো ত তার নামে কিছু খারাপ কথা শুনে নি। সমিতির ঘরের পাশেই তার ঘর। সমিতির ঘরটা পাড়ার সবারই। অনেকেই দেখেছে মেয়েটিকে। মাঝে মাঝে সমিতির অফিসে জমা-হওয়া লোকগুলি বাদলার ঘরে গিয়েও বসেছে, বেশী

লোক হলে। সমিতির ঘরে স্থান সংকুলান হয় না বলে বাদলার উঠানে সভা হয়েছে। এখনো হয়। কিন্তু—

না, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না ভূষণ।

—কি বৈলছে? জামাই সথে আস্যাছিল?

—না। কি বৈলব। বৈলতেও সরম লাগে।

ভূষণ বললো, সরম কি, বল।

বাদলা এক মুহূর্ত থেমে নিজেই বললো, বলে কি না—ছিঃ ছিঃ অমন কথা-ট বলি কি কৈরে রে? রসনা খসে যাবেক যে। বলত, মন্তু ঠাকুর কত ভাল মানুষ; কাকা কাকা করে আমাকে। বিটিটকে, তুরাই ত দেখেছিস, বুনের মতন স্থাখে। সেই মানুষ কি—

ভূষণ বুঝলো ব্যাপারটা। ধীরে ধীরে বললো, তুই ঘর যা বাদলা। বিহারী আসুক। বিটিটকে কাঁদতে মানা কর্‌বি।

বাদলা যাবার আগে বলে গেলো, তাই যাই। বিহারীকে পাঠাই দিস। স্থাখ দেখি মন্তু ঠাকুরের কানে গেলে কি ভাববেক উ! চলি তবে—

—হঁ যা।

বাদলা বেরিয়ে গেলো। সাথে সাথে ভূষণও দরজা পর্য্যন্ত তারপর ফিরে এসে আবার বসলো খাটিয়াটায়।

ভামি ও সাবির দৃষ্টি ওর দিকে। মুখে কথাটি নেই ভূষণের। ভূষণ জানে কেনারাম, শোলু রায়দের চরিত্র। এবার এরাই এখানে সেখানে কৌশলে প্রচার করবে, বাদলার মেয়েটার সর্বনাশ করেছে সমিতির ছোকরারা। তারপর আরো দু একটা দিন পরে মন্তু ঠাকুরের নামটা যোগ করে, ঘটনাটাকে আরো একটু রঙ মাখাবে। সব শেষে বলবে—সমিতি ত নয়, প্রেম করার আড্ডা। ভূষণের অন্তরটা রাগে ফুসতে লাগলো। এর একটা বিহিত হওয়া উচিত। শিরোমণিকে সোজাসুজি জিগ্যেস করা উচিত—কি খারাপ চাল-চলন সে দেখেছে।

রাত একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। সাবির ঘরে মানি বসে আছে, সাবির কাছে। পাড়ার আরো দু চার-জন মেয়ে একে একে আসে। একই সঙ্গে সবাই মিলে গান গায়। সাবি ভাদুর গান বাঁধতে পারে। একটা বেঁধেওছে। কালকে গাইছিল। বেশ গানটি - কথাগুলি মনে নেই ভূষণের তবে বিষয়টা মনে আছে—পাড়ার পাঠশাল খুলেছে সমিতি, ভাদু সেই পাঠশালে বই শ্লেট নয়ে পড়তে যাবে—

ভাম্মি হাতের কাজ শেষ করে ছেলেটাকে নিয়ে দাওয়ার উপর আচল বিছিয়ে শুয়েছিল। শুয়ে থাকতে থাকতে কখন চোখ দুটো লেগে গিয়েছিল, তারপর হঠাৎ নিজেই জেগে উঠেই তখনো ভূষণকে অমনি একই ভাবে বসে থাকতে দেখে জিগ্যেস্ করলো। খাবে? দিব?

এতক্ষণ বিহারীর অপেক্ষাতেই বসেছিল ভূষণ। কখন আসবে কে জানে, ওদিকে আবার ঠিক সময়ে হাজির না হলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে; অবশ্য মাঠে আরো মানুষ আছে। সারা রাতটাই জেগে থাকে আপন আপন মাচায়। মাঝে মাঝে জেগে যে আছে, তার জানানি দিয়ে দেয়।

—দে! বললো ভূষণ।

খাওয়া-দাওয়া করে মোটা লাঠিটা নিয়ে বেরুবে এমনি সময়ে বিহারী ঢুকলো।

—কি রে—এত রাত হৈল? জিগ্যেস্ করলো ভূষণ।

বিহারী বললো, একট না এক-ট ঝামেলা।

—বাদলা গেইছিল?

—হঁ। বৈল্লব সব। ক্ষেতে যাইছ?

—হঁ।

—যাও। কাল শুনবে।

তারপর দিন জেনেছে ভূষণ।

বাদলার মুখে ওই সব কথা শুনে বিহারী। বাদলা আর নামোকুলির দু জনকে নিয়ে গিয়েছিল শিরোমণির ঘরে। জামাইটা কিছুই জানেনা। বিহারী সব জানতে চেয়েছিল শিরোমণির মুখ থেকে। শিরোমণি 'স্বভাব চরিত্র' ভালো নয়, তাই বলেছিল, এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি কেউই। কী খারাপ সে দেখেছে। তাহলে এটা নিয়ে 'বাইশী' (সভা) ডাকতে হয়। ওখানে বিচার হোক। যার দোষ তার শাস্তিও হবে। বিচারের কথাতেই শিরোমণি বলেছে, সে নিজে দেখেনি, তবে শোলু রায় ত মিথ্যে কথা বলার লোক নয়। একথায় হেসে উঠেছিল সবাই। বিহারী স্পষ্টই বলে দিয়েছে, ছাড়া-ছাড়ি হলে ক্ষতি নেই। মেয়েটার আর ভাল বরে বিয়ে দিবে। কিন্তু তার ব্যাটা কি বলে—তা জানা দরকার। ব্যাটাকে জিজ্ঞেস্ করায় সে বলেছে। না ছাড়বে কেন? ছাড়লে লোকে বলবে কি?

ভূষণ সব শুনে বললো, বিটি-টকে এখন না পাঠানই ভাল রে!

—ক্যানে? মার-ধর করবেক? জিগ্যেস্ করলো বিহারী।

—যদি করে ?

—আরে রাখো, সে-দিন চলে গেইছে।

(৮)

রঙ ধরেছে ধানের শিসে। হাওয়ায় মাথা কুটছে ধানের গাছ। আর তাই দেখে ভূষণের মনে হয়েছে—ওরা যেন বায়না ধরেছে ঘরে আসার জন্য।

আবার সেই স্বপ্নটা দেখা দেয়। নিজের জমির ধান আসবে, খামার হবে, ঘরটা ছাদন করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার স্বপ্নটা বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে। খুশিতে টগ্-বগ্ করছে ভূষণের হৃদয়টা।

ভাদ্র শেষ হয়েছে। আশ্বিনের পূজোও শেষ হয়ে গেছে। এবার পূজোতে আনন্দ করেছে এরা। মুরুলি ত সারা পূজোটাই নিজের ঘরে গান গেয়েছে। আজকাল আবার একটা পায়ে এক থোক্ ঘুঙুর পরে মুরুলি। গায়, আর তালে তালে নাচে। জমেছিল পূজোটা। বৌ-বিটির মুখেও হাসি ফুটেছিল। এবার পরবে ভূষণ ভামি আর মানিকে শাড়ি দিয়েছে। পরের মেয়েটাকে ফ্রক আর ছেলেটার জন্য একটা হাপ্-প্যাণ্ট আর জামা। অনেক টাকা লেগেছে। তার কিছু দিয়েছে কিছু বাকী আছে রাধুর কাছে। রাধুও এবার শাড়ী-ধুতি জামা নিয়ে এসেছে আসানসোলের বাজার থেকে।

ভামি লাল পেড়ে শাড়ীটা পরে ষষ্ঠীর দিন, ঘরে মাওলি দিয়েছে। তার উপর আলপনা দিয়ে দিয়েছে সাবি। মানি পূজোর দিন কয়টা সেজে গুজে শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে সঙ্গিনীদের সঙ্গে।

এই দিনেও সমানে পাহারা বসেছে ক্ষেতে ক্ষেতে। এই সময়টাই কঠিন সময়। গাছটাকে ঠিক রেখে রাতের অন্ধকারে শিস্গুলি নিপুণভাবে ভেঙে নিয়ে যাবার আছে। তার চেয়েও বড়ো আশংকা রাতারাতি একেবারে উজাড় ক'রে কেটে নিয়ে যাবার। সমিতি থেকে বলেছে, ধান কাটার মরশুমে থানা থেকে পুলিশ আসবে। বামফ্রন্ট্ নির্দেশ দিয়েছে, ধান কাটার মরশুমে যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। পুলিশ ক্যাম্প বসবে, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। কোনো হাঙ্গামা হলে—সেই খানেই বিচার হবে। পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন জোতদারের বাড়ীতে না থাকে। যারা বর্গাদার তাদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা নিজের খামারে ধান তুলে, জমির মালিকের প্রাপ্য দিয়ে দিবে, যাদের

নাম এখনো রেকর্ডভুক্ত হয়নি। তারা ধান দিয়ে রসিদ নিবে। কোনো জমির মালিক রসিদ দিতে না-চাইলে তার আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে।

এসব কথা কখনো শুনেনি ভূষণ।

কিন্তুক এতদিন ত বাঁচাই রাখা যাইরে। বলে ভামি।

—তা ত চাই-ই। উত্তর দেয় বিহারী।

—পাহারা ত চলছেই রে? বলে ভূষণ।

হাঁ পাহারা চলছে। ক্ষেতে ক্ষেতে পাহারা, পল্লীতে পল্লীতে পাহারা।

মাঠের কোণে কোণে উচু মাচা আগেই বাঁধানো হয়েছে। সেই মাচায় সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে জেগে থাকে মানুষ। মাঝে মাঝে রাত্রের নিস্তব্ধতা সচকিত হয়ে উঠে প্রহরারত মানুষগুলির চীৎকারে—সা-ব-ধা-ন। হৈ—হোঃ হৈ—হোঃ আরেক প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে আসে হৈ—হোঃ হৈ—হোঃ।

গাঁয়ে পাহারা দেবার পার্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে দারেগাবাবুও দুবার এসে দেখা করে গেছে ব্যোমকেশ মাষ্টারের সঙ্গে।

ঘরে ঘরে মেয়েরা—কেউ ঘুমোয়, কেউ জেগে থাকে।

সাবি মানিকে পাশে নিয়ে শোয়। মানি জড়িয়ে ধরে থাকে সাবিকে। আবার মাঝে মাঝে চমকে উঠে। সাবি বলে, কি হৈল তুর? মানি বলে, তুর সাথে শুব নাই।

—ক্যানে?

মানি চুপি চুপি যে কথাটা বলে, তা শুনে হাসি পায় সাবির।

সত্য, মাঝে মাঝে পেটে হাত রাখলে সেও চমকে উঠে। পরক্ষণেই আবার একটা অপূর্ব শিহরণ জাগে ওর সর্বাঙ্গে।

দিনগুণে সাবি—আর একটা মাস পরেই মা হবে সে।

ভামি দাওয়ার উপর ছেলেগুলিকে নিয়ে ঘুমোয় আবার একটু শব্দ হলেই জেগে উঠে।

—ক্যারে, ক্যা?

মুরুলির ঘরে বিঁদি সারা রাতটাই থাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। সেও পাহারা দেয়।

ভামির কথা শুনে বলে, তুমরা ঘুমাও ভাজ বৌ, আমি উয়াদের পায়ের শব্দ চিনি!

সেদিন রাত তখন গভীর। আকাশের চাঁদটা কখন ডুবে গিয়েছে। সারা

গ্রামটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে মাঠ থেকে ভেসে আসা ওই শব্দ। আর কুলি রাস্তায় কয়েক জনের পায়ের শব্দ।

কিছুতেই ঘুম আসছে না সাবির। মাঝে মাঝেই ভামিকে ডাকে, খুড়শাস্!

সাবিকে নিয়ে ভামির ভাবনাটাও কম নয়। ন' মাসের পুয়াতি সাবি। তারপর এই প্রথম পুয়াতি। এই সময় নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ভামির তেমন কিছু হয়নি। তবু ওই মাষ্টারের কথায় একবার দেখিয়ে এসেছে থানার সরকারি ডাক্তারকে। ডাক্তার বলেছে—ব্যথা উঠলেই যেন হাঁসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

ভামি এ কথা শুনে হেসেছে। ভদ্দর লোকের বৌ-বেটি হাঁসপাতালে বড়ো একটা যায়না, অন্ততঃ এই গ্রাম থেকে কাকেও যেতে দেখিনি। প্রসব-বেদনা হলে খবর দিয়েছে রামা ডোমের বৌকে, রামা ডোমের বৌ এসে পেটে তেল মালিশ করেছে, বেদনা যাতে বাড়ে তার জন্য ওষুধ দিয়েছে, কখনো কখনো আবার মাথার চুলের গোছা মুখে পুরে নিতে বলেছে,—এই ত দেখে এসেছে ভামি। তারও তিনটা ছেলে-মেয়ে ওই রামা ডোমের বৌয়ের হাতেই হয়েছে। এখন রামা ডোমের বৌ নেই, তার জায়গায় শীতলা বাউরার বৌ ধাত্রীর কাজ করে। সেই শীতলার বৌকে বলে রেখেছে ভামি। তাই সাবি একটু উঠা-বসা করলেই, ভামি জানতে চায় কিছু হচ্ছে নাকি,

সেদিন ভামিকে ডাকতেই ভামি বললো, কি হৈছে লো?

—না কিছু হয় নাই। সাবি উঠে বসেছে খাটিয়ায়।

—তবে উঠলি যে, মরদদের ডাকতে পাঠাব?

—না গো না, কিছু হয় নাই।

—সত্যি বল!

এখন পেটের সন্তানটা নড়া-চড়া বেশিই করে। আর যখনি ওটা একটু চঞ্চল হয়ে যায়, তখন সাবিও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। পেটের কাপড়টা সরিয়ে দেয় পেটের উপর হাত বুলোয়। অদৃশ্য জীবট যেন খানিটা শান্ত হয়।

কিন্তু হলে কি হবে,—এরই মধ্যে সাবির সব টুকু শক্তিকে ওই ছোট্ট জীবটা যেন হরণ ক'রে নিয়েছে। ওর শাসনেই এখন চলতে হয় সাবিকে। বাইরে বেরুতে লজ্জা করে পুকুর ঘাটে যেতে হয়—যায়, কিন্তু চলার গতি মন্থর। রান্নাটা মানিই করে দেয়। রাঁধতে দেয়না ওকে। তা না হয় হলো কিন্তু এই যে এবারে ধান কাটবে—তার কত কাজ—ক্ষেত থেকে ধানের বোঝা মাথায় করে আনা,

খামার নিকানো—এ সব কে করবে। তারপর আরো ত কাজের বোঝা পড়বে। ধান সিদ্ধ করা ঢেঁকিতে চাল করা। রাখা-ঢাকা, পিঠা পরব, হাজার রকমের ব্যবসা। এ সব? এ সব কথা মানিকে বলেছে সাবি। মানি ভরসা দিয়েছে, সাবি ভাজের সব কাজ সে নিজে করে দিবে। সাবি খুশি হয়। আস্তে আস্তে বলে, তুর যে কত অবসর? মানি সরল ভাবেই জবাব দেয়, ঘরে ত আর রাঁধতে হয় না, মা রাঁধে, খামারও মা নিকবেই। তবে অবসর হবেক নাই? সাবির হাসি পায়। মানির নরম গাল দুটি টিপে বলে, তুই রাঁধছিস্ আর সেই সময় শ্যামের বাঁশী বাজে তখন ত সব ছাড়া ছুটবি!

এর কোনো জবাব দেয়না মানি।

সাবি আবার বলে, কতদিন আর এই লুকলুকানি খেলবি লো? হাতে ধরে বল 'ইবারে লিয়ে চল'।

ঠিক এই কথাটাই সেদিন পানুকে জিগ্যেস্ করেছিল মানি।

দুর্গোপুজোয় বামুন-বদ্যি-কায়স্থরা প্রতিবছরই যাত্রা করে কেনারামের দুর্গার সামনে। এবারেও করেছিল। যাত্রার আসরের প্রথমেই বসে ভদ্র ঘরের পুরুষরা, তারপর থেকে তাদের মেয়ে বৌ-রা-বাউরী বাগ্দীরা থাকে একেবারে শেষে। ভদ্রলোকের মেয়ে-পুরুষের জন্য সতরঞ্চি নয় অন্য কিছু পাতা থাকে। বাউরী মেয়েরা সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে হয় নিজেদের নিয়ে যাওয়া চটে বসে, নয় একেবারে মাটিতে।

এবারে গাঁয়ের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে। কেনারাম শোলুরামের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত লাগায়। ফারকটা বেড়ে গেছে বলা ত যায়না, ঘর খালি করে যাত্রা দেখতে গেলে-একটা বিপদও ত হতে পারে। ঘরে এমন কিছু সম্পত্তি নেই যে নিয়ে যাবে, কিন্তু ঘরে আগুনও ত দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু যাত্রার ওই ভীড়ের মধ্যে কাকেও টেনেও নিয়ে যেতে পারে অতএব কেউ যাবেনা সেখানে—এই সিদ্ধান্ত।

কিন্তু বছরে ওই একবারই ত যাত্রা হয়। বলল্-মল পোষাক পরে রাজা আসে রাণীর চুমকি-দেওয়া শাড়ী, তারপর বাই-দের নাচ! রোখা-ধোবার মেয়ে সেজে গান-, এই সবগুলি মানির মনে একটা স্থান অধিকার করে থাকে। রোখা ধোবার গানের সুরটিকে নিয়ে নিজের পদ্দগানে সুর দেয়। আবার গুন গুন করে গানও গায়।

—তাই বৈলে বছরের যাত্রা একবার দেখব নাই? জিগ্যেস্ করেছিল মানি।

বিহারী বলেছিল, আমরা কলকাতার দল আনব।

—কবে শুনি ?

—কালী পূজার পর।

—ঠিক বৈলছ ?

—ঠিক। ম্যাষ্টর যাবেক। নিয়ে আসবেক।

তাই হয়েছিল! কালী পূজার পরেই এসেছিল কলকাতা থেকে একটা দল ঃ গানের দল। বাথানে কয়েকটা চৌকী দিয়ে একটা মঞ্চ। মাথার উপর একটু-খানি একটা ছাদন। কোনো দিকেই কোনো ঢাকা নেই। তবে, ছিল একটা যন্ত্র—ওটাকে মুখের কাছে নিয়ে কথা কইলে কথাটা জোরে হয়।

সেই আসরে সেজেগুজে গিয়েছিল মানি। মাথা বেঁধেছিল। পূজোর শাড়ীটা মোট্ থেকে বের করে পরেছিল। সাবি সাজতে চায় নি। কিন্তু মানি তাকে জোর করে মাথা বাঁধিয়েছিল, শাড়ী পরিয়েছিল, তারপর নিজের সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছিল। ভামিও গিয়েছিল। কারো জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না, যার যেখানে খুশি সেখানেই বসেছিল ওরা। সাবির লজ্জা, কিছুতেই ও আগে বসবে না। সে ভামির কাছে—পিছনে এক পাশে বসেছিল। মানির কিন্তু সকলের আগে বসার ইচ্ছা। পুরুষরাও বসেছে ওখানে। তবু কিন্তু মায়ের কথায় বসতেই হয়েছিল তাকে সাবির পাশে।

সবারই যখন দৃষ্টি মঞ্চের দিকে তখন মানির দৃষ্টিটা ঘুরছিল। এমনি সময়েই সাবি মানির গায়ে চিমটি কেটে বলেছিল, দেখলি ?

—কি ?

—যাকে খুজছিস্ ? উই দেখ্।

সত্যিই মঞ্চের এক পাশে দাঁড়িয়েছিল পানু। মানি তাকিয়েছিল তার দিকেই। কিন্তু পানু ? ওরও মাথাটা এদিক-ওদিক ঘুরছিল, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল সামনে বসে থাকা মেয়ে-পুরুষদের দিকে। কিন্তু মানি কিছুতেই ঠিক করতে পারেনি—এমন ভাবে তাকিয়ে থেকে কি খোঁজা যায়। ও যে মানিকেই খুঁজছে, সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে সে ত একবার এদিকেও আসতে পারে!

একবার উঠে দাঁড়িয়েছিল মানি। ভামি তৎক্ষণাৎ বলেছিল আবার উঠলি কেনে ?

এমনি সময়েই মাইকের সামনে হারমোনিয়াম তবলা ডুগি নিয়ে যারা বসেছিল,

তাদেরই একজন বলেছিল, আমরা প্রথমে এ গ্রামের শিল্পী কমরেডদের গান বাঁশী শুনবো। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন, শিল্পী পানু বাউরী।

বুকটা ধক্ করে উঠেছিল মানির প্রথমে, তারপর একটা আনন্দে বুকটা ভরে উঠেছিল।

—বৈস তাই। আবার তাড়া দিয়েছিল ভামি।

মানি বলেছিল, পা-গলা ধৈরে গেইছে।

সাবি বলেছিল, তুই বরং সামনে যায়্যাই বৈস ঠাকুরঝি।

— তাই যা।

ভামির হুকুমটা পেয়েই চলে গিয়েছিল মানি। একপাশে গিয়ে প্রথমে দাঁড়িয়েছিল।

পানুর বাঁশীর দিকে মন নেই মানির। বাঁশীর সুরের উর্ধে আরো যে একটি সুর তার সমস্ত অন্তরকে জড়িয়েছিল, সেটি প্রকাশ করা যায় না।

পানুর বাঁশী হয়ে গেলেই, শ্রোতাদের মাঝখান থেকে উঠেছিল করতালি। সবারই যে ভালো লেগেছিল এটা তারই প্রকাশ-মাধ্যম। মানি তালি দেয়নি, তবে মুখখানা খুশিতে ভরে উঠেছিল। পানু বাঁশী বাজিয়ে মঞ্চের থেকে নেমে, মঞ্চের পাশেই, যেখানে দাঁড়িয়েছিল বিহারী, ব্যোমকেশ মাষ্টার আর মনুরা সেই খানেই দাঁড়িয়েছিল।

মানির ইচ্ছা হয়েছিল একবার সেখানে যায়। কিন্তু যাবে কি করে, ওখানে গেলেই মায়ের নজর যাবে। তাই একটা মতলব মাথায় এসেছিল তার। মায়ের কাছ থেকে অনুমতিটা নিয়েই যাওয়া ভালো।

ভামির কাছে যেতেই ভামি বলেছিল, ঘরে তুর বাপ একাই আছে যে লো!

—দেখে আসব মা। বাবাকে দেখে আইস-ব। বলেছিল মানি।

—একা যাবি কি কৈর‍্যা। না হলে ত গেলেই হৈত।

—বিহারী দাদাকে বলছি,—বৈলব?

—দেখ্ যদি সঙ্গী পাস্।

এবার সবারই সামনে একেবারে মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মানি। মানির চোখের সঙ্গে পানুর চোখ পড়তেই মানি একটু হেসে উঠেছিল ফিক্ করে।

—শুনলি মানি, পানুর বাঁশী শুনলি? জিগোস করলো বিহারী।

—শুনেছি।

—কেমন লাগলো?

এর কোনো জবাব না দিয়ে পান্নুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিল মানি। তারপর মা যে কথাটা বলেছে, তাই বলতেই বিহারী জিগোস্ করেছিল, মুরুলির গান শুনবি নাই ?

—মুরুলি দাদার গায়েন ত রোজই শুনছি, এই সময় একবার দেখে আসি। ইয়ার পরে ত কলকাতার গায়েন।

—বেশ, যা।

—যাব কার সঙ্গে ? তুমি ত যাবে নাই ! কাহকে বল ক্যানে সঙ্গে যাবেক। যাব আর আইস-ব।

বিহারী পান্নুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, যা ত রে।

পান্নু বেরিয়ে এসেছিল আসর থেকে। ওর পিছনে পিছনেই মানি। দূরত্বটা সামান্যই। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হচ্ছিল মানির, সে গিয়ে ওর পাশে পাশে যায়। কিন্তু কিছুতেই আর সে কাজটি করতে পারছিল না।

পান্নুর মনে তখনো সকলের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার একটা আনন্দ। কলকাতার শিল্পীরা তার বাঁশী শুনেছে—প্রশংসাও করেছে। বলেছে অনুষ্ঠানের পর আবার তার সঙ্গে কথা বলবে। এইসব ভাবতে ভাবতেই একটু পা চালিয়েই যাচ্ছিল পান্নু। একটা সময় চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আয় জলদি।

—অত ছুটলে যাব কি কৈরে ?

একটু পা চালিয়েই চলছিল পান্নু। কলকাতার দল, এরা আবার নাকি যেখানে সেখানে যায় না। যেখানে কৃষকরা আন্দোলন করে, যেখানে কারখানার শ্রমিকরা লড়াই করে, সেইখানে যায়। ওদের গান শোনায়, সে গানও নাকি অন্য রকম। অন্য সুর অন্য কথা। রঘু ধোবার নিয়তির গান নয় যে, কখনো হাত বাড়িয়ে ঘুরে ঘুরে গাইবে।

এসব কথা মাষ্টার বলেছিল বিহারীকে। আর বিহারী সারা গ্রামেই বলে বেড়িয়েছে। এ গ্রামে এসেছে—এখানকার গরীব মানুষগুলি লড়াই করছে বলে। এরা আপনার লোক। তাই মানুষগুলি এসেই কেমন মিলে গিয়েছিল গরীব মানুষগুলির সঙ্গে। সবাইকে ডাকছিল কমরেড্ বলে। কমরেড্ কথাটার মানে জানত না। সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছিল মাষ্টার। শুধু কি মিশে যাওয়া, বাউরীদের রান্না—তাই খেয়েছিল। পান্নুকেও কমরেড্ বলে ডেকেছিল ওরা। পান্নুর বুকটা ভরে গিয়েছিল।

—লে আয়। দাঁড়িয়েছিল পানু। মানি একেবারে পানুর পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—চল্ ইবারে।

চলতে চলতে আবার পিছনে পড়ে যাচ্ছিল সাবি। আবার দাঁড়াতে হচ্ছিল পানুকে। শেষের বার মানির হাতটা খপ্ করে ধরে হেঁচকা টান দিতেই মানি নিজেকে সামলাতে না পেরে একেবারে পানুর গায়ে এসে পড়তেই, পানু ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। অবশ্য মানি ওর গায়ে পড়তে চায়নি আবার পানুও মানিকে জড়িয়ে ধরতে চায়নি। ধরেই ছেড়ে দিয়েছিল পানু।

ক্ষণিকের জন্য হলেও একটা অপূর্ব শিহরণ খেলে গিয়েছিল সারা অঙ্গে। মনে মনে ভেবেছিল, পানু তাকে ভালোবাসে—এটাকে ও ভালোবাসার স্বীকৃতি হিসাবেই গ্রহণ করেছিল।

রাতটা অন্ধকার। পথটা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না, তবে পরিচিত রাস্তা এই যা। তবু গা-টা ছম্ ছম্ করছিল মানির। সে আস্তে আস্তে বলেছিল, অন্ধকারে ডর লাগে।

—লে হাত-ট ধর।

—আবার ত ছাড়্যা দিবে।

—না।

এই কথাগুলোই মানি চেপে রাখতে পারে নি। বলেছিল সাবিকে তারপরদিনই।

মানির কথাটা মনে হতেই সাবি ভামিকে বললো, শুনছ খুড়শাস?

—কি বল্, জবাব দিলো ভামি।

—ঠাকুরঝির বিয়া দাও ইবারে।

ভামির মনেও কথাটা যে-উকি দেয়নি তা নয়, এবারে ধান উঠলেই মানির বিয়ের জন্য ছুটা-ছুটি করতে হবে,-এটা ঠিকই করে রেখেছিল ভামি।

ভামি বললো, বর দেখে দে, তবে ত।

সাবি বিছানা থেকে উঠে বসে বললো, সে আমি দেখে রাখ্যাছি।

—ভালোই ত।

(৭)

বাতাসে পাকা ধানের গন্ধ। মাঠে মাঠে ধান কাটা চলছে। মানুষগুলি সেই সকালে যায় কাস্তে গুলিকে কোমরে গুঁজে। বাঁ হাতের মুঠিতে ধানের

গোড়া ধরে-মুঠি মুঠি ধান কেটে সাজায় একটা জায়গায়, তারপর বিঁড়ে বাঁধে বিঁড়েগুলিকে আবার সাজিয়ে রাখে। দেখলে মনে হয় সন্থ ছাওয়া চালা ঘর। ফিরে আসে সন্ধ্যায়। মেয়েরা মাথায় করে ধানের বোঝা নিয়ে আসে। যাদের বেশী ধান তারা আনে গাড়ীতে করে।

মানি খাবার নিয়ে যায় ভূষণ আর বিহারীর। ক্ষেতের উপরই ন্যাকড়ায় বাঁধা জামবাটির খাবারটা রেখে দিয়ে। নিজের মনেই গুণ-গুণ ক'রে গান করে। গানটা কলকাতার কমরেডরা করেছিল। সবটা মনে নেই। তবু যেটুকু মনে আছে তাই গায়—

হৈ সামালো ভাই হো
কাস্তে তে দাও শান হো—

তার পরের লাইনটা মনে না-থাকায়-শুধু সুরটাই আওড়ায়, তারপরের লাইনটা জোরে জোরেই বলে,

আর দিব না আর দিব না
ধান মোদের-মান হো—

মেয়ের গলায় গান শুনে ভূষণ হাসে।

—কি গান গাইছিস্ বিটি?

মানি লজ্জা পায়। একেটু হাসে। সে হাসি টুকু বড়ো মধুর মনে হয় ভূষণের।

সেদিন তাই হয়েছে, ভূষণ আর বিহারীকে যেতে দিয়ে সে একেবারে বাচ্চা মেয়ের মত শাড়ীর আঁচলটাকে কোমরে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে এক জায়গা থেকে আরো একটা জায়গায় লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে, আর গাইছে ওই গানটাই। গানটার কলিগুলো সুরের সঙ্গে ভর করে, এক মাঠ থেকে আরো এক মাঠে যাচ্ছে ভেসে। যারা মাঠে ছিল তারা সেই সুরের আকর্ষণে মাথাটা তুলে একবার তাকিয়ে দেখছি। ওদের মধ্যেই এক জনের সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মানি।

তাকিয়ে আছে পানু-ডান হাতে তার শান দেওয়া কাস্তেটা রোদের আলোয় চক্ চক্ করছে আর বাঁ হাতের মুটিতে আটকে আছে, এক গুচ্ছ ধান।

পানু চোখের ইসারায় ডাকলো মানিকে। মানির মুখে দুষ্ট হাসি। সে ইসারাতেই জানিয়ে দিল, না, এখন না। মাঠ ভর্তি লোক, একি—এখন যাওয়া যায়?

—কে. ভূষণের বিটি মানি নাকি ?

চমকে উঠলো মানি! তাকিয়ে দেখল পিছন পানে—সুভাষ ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় তার একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি। ঝুড়ির উপর ধান সমেত গোটা পনেরো বিশ আঁটি। ধানের আড়ালে মুখটা ঢেকে গেছে সুভাষ ঠাকুরের।

—হুঁ হে। কি আছে ঝুড়িতে ?

ঘরে থেকে ধান কাটা হচ্ছে সবে থেকেই সুভাষ ঠাকুর একটা ঝুড়িতে, তেলে ভাজা, কলাই ভাজা। কলাই-ভরা মুড়ি, তারই এক দিকে বিড়ি দিয়াশিলাই সাজিয়ে নিয়ে আসে মাঠে ক্ষেতে ক্ষেতে যেখানে মানুষগুলি ধান কাটার ব্যস্ত, সেই খানে নিয়ে যায়। এ সময় ক্ষিদে পায় মানুষগুলির। তারা এক-একটা আঁটির বিনিময়ে নেয় তেলে ভাজা, নয়-ছোলা ভাজা। কেউ আবার বিড়ি।

—এখন কি আর কিছু আছে ? দাড়া দেখি।

সুভাষ ঠাকুর ঝুড়িটা নামালো মাথা থেকে। ধানের আঁটি গুলি সরিয়ে দিয়ে কাপড়ের আচ্ছাদনটা খুললো সুভাষ। এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে আছে কিছু সামগ্রী।

মানি বললো, ওই ত আছে।

এগুলে কি খায় কাল তোকে এনে দিব। বললো সুভাষ।

সাবি ভাজ. কিছু খেতে পারেনা আজ-কাল। যেমনকার ভাত, তেমনি পড়ে থাকে। একবার নাড়া-চাড়া ক'রে উঠে যায়। এই ছোলা ভাজা, তেল দিয় লঙ্কা দিয়ে ভাজা ছোলা ভিজা, খেতে ভালো লাগে। এগুলো নিয়ে গিয়ে ওকে দিবে মানি।

- ওই দাও।

তাই দিলো সুভাষ। ওগুলি আচলের খুটে বেঁধে মানি বললো দাঁড়াও ধানের আঁটি আন্যা দি। সুভাষ ঠাকুর বললো, না রে, ওর আর দাম লাগ বনা।

ওদিকে খাওয়া হয়ে গেছে ভূষণ আর বিহারীর। ভূষণ একট কলকের তামাক সেজে তাই টানছে। বিহারী হাঁটু দুটোকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বসে আছে।

মানি কাছে এসে দাঁড়াতেই ভূষণ বললো, খামার লিকাইছে মানি ?

বাউরী পাড়ার যে-যেমন চাষ করেছে, সেই তেমনি খামার করেছে।

ভূষণ আর বিহারী একই সঙ্গে খামার হবে। ভূষণের ঘরের পাশেই গিরির টিপেটায়। জায়গায় এতকাল জঙ্গলে ভর্তি ছিল। কবে মরে গেছে গিরি —

একেবারে না-খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে কেমন আস্তে আস্তে চোখের সামনে ঘরে গিয়েছিল গিরি। ওর এই মৃত্যুর তখন কোনো প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়নি। এটাই ছিল স্বাভাবিক।

সেদিন স্থানটা পরিষ্কার করতে করতে সে কথাই ভাবছিল ভূষণ। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল আজ যদি বেঁচে থাকত গিরি—

সেই গিরির ভিটেয় খামার করবে, অথচ গিরি নেই।

বাপের কথার জবাবে মানি বললো, দেখবে চল ক্যান্নে। বিঁদি পিশি এক ঝুড়ি গোবর আন্যাছে। —কে? জিগ্যোস্ করলো ভূষণ।

—বল্‌লাম ত—বিঁদি পিশি।

ভূষণ তাকালো বিহারীর দিকে। খুশিতে মনটা ভরে গেলো। তবু আবার জিগ্যেস্ করলো, ক্যানে, তুর মা?

—বিঁদি পিশি করতে দিলে ত? উ বললেক, আমি রইতে বড় ভাজ আবার গোবর কুড়াতে যাবেক কি?

মেয়ের মুখে বিঁদির কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল ভূষণ।

সুভাষ ঠাকুর মাঠের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বললো। বড হাসি যে হে।

বিহারী বললো, আইস ঠাকুর তুমিও হাসে যাও।

ভূষণ বিকেলে ফিরে এসে প্রথমেই দেখলো খামারটাকে। হাঁ। সত্যিই একেবারে ঝক্-ঝকে করে তুলেছে। ওখানে পা ফেলতেও ইচ্ছা করে না?

—কি দেখছ? জিগ্যেস্ করলো ভামি।

—ই যে একেবারে ঠাকুর ফাল্‌ কৈর‍্যা দিয়েছিস্।

ওমা, ও সাবি-বৌ শুন্, বলি ঠাকুর থান লয়? লক্ষ্মী বলে কথা। এই পেরথম্ পা দিছেন।

তাই বটে। এই প্রথম লক্ষ্মী আসছে ঘরে। লক্ষ্মী যাতে থাকেনা তার ব্যবস্থা করতে হবে বৈকী।

—এদিকে ত লক্ষ্মী আসছেন, বিহারীর ঘরে আবার কে আসে দেখ। লক্ষ্মী না নারয়ণ।

ভামির কথা শুনে মুখে কাপড়টা দিয়ে সরে গেলো সাবি।

মানি সাবির পিছনে পিছনে এসে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলো, ইবারে টুসু করবি নাই ভাজ?

সাবি একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখলো মানিকে।